নিজে পড়ি

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

কিছু কথা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নির্ধারিত পাঠক্রম অনুসারে এই ষষ্ঠ পাঠমালার বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ক্রমশ ভাষাচর্চার মাধ্যমে ভাব-বিনিময়ের অনুশীলন করতে পারে, সেদিকে সযত্ন লক্ষ্য রেখে এই বইতে বিবিধ বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়েছে। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে লেখক-লেখিকাদের যথাসম্ভব পরিচয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখারও সারমর্ম।

শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে বাংলাভাষা ব্যবহারে বেশ সক্ষম হয়েছে, এই ভাষা এখন অনেকটা তাদের দখলে এসেছে। এখন তারা শিখছে বাংলাভাষার মাধ্যমে চিন্তা করতে এবং ভাবধারা প্রকাশ করতে। সেই উদ্দেশ্যেই অনেকগুলি ভাবমূলক কবিতাও সংকলিত হল, যাতে ছোটবেলা থেকেই কবিতার ভাবঘন ভাষার গভীরতা উপলব্ধির চর্চা করতে শেখে শিক্ষার্থীরা। কবিতাগুলি পাঠ করলে তাদের মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি জাগে, তা বিনা দ্বিধায় নিজের ভাষায় প্রকাশ করবার উৎসাহ জাগাতে হবে।

গদ্যাংশগুলি পাঠ করার পরে শিক্ষার্থীরা কতখানি বিষয়বস্তু উপলব্ধি করেছে, তা যাচাই করতে হবে অনুশীলনীর মাধ্যমে। যথেষ্ট পরিমাণে নমুনা অনুশীলনী প্রত্যেকটি গদ্য ও কবিতার শেষে দেওয়া হয়েছে ; যাঁরা পড়াবেন, তাঁরা আরও অনুশীলনী-প্রশ্ন গড়ে নিতে পারবেন।

পাঠক্রমে নির্ধারিত ব্যাকরণের কিছু আনুষঙ্গিক অনুশীলনীও বিষয়বস্তুর সামিল করা হয়েছে। এমনি আরও অনুশীলনী থাকছে 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' ষষ্ঠ অনুশীলনী গ্রন্থটিতে—যেটি এই পাঠমালাটির পরিপূরক ও সহায়ক পুস্তক।

এই পাঠমালায় রইল একটি নাটিকা—যেটি শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই অভিনয় ক'রে আনন্দ পাবে, আবার পরে বিদ্যালয়ের কোনও উৎসবে রূপদান করতেও পারবে।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজে পড়ি

৬

ষষ্ঠ পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট লংম্যান

রেজিস্টার্ড অফিস
৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
জামাল রোড, পাটনা ৮০০ ০০১

ISBN 0 86131 718 1

চিত্রশিল্পী : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬

প্রকাশক :
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রাকর :
পি. এম্. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

শীতের ফুল

প্রিয়ম্বদা দেবী

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৫৫): পাবনার গুইগাছা গ্রামে জন্ম। পিতা — কৃষ্ণকমল বাগচী, মাতা — প্রসন্নময়ী দেবী। প্রসন্নময়ীও কবিতা লিখতেন। স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবী। প্রিয়ম্বদা দেবী বি.এ. পাস ক'রে শিক্ষকতা করতেন। কাব্য ও ছোটদের রচনার জন্য তিনি পরিচিত।

শীতের সকাল বেলা বসেনি ফুলের মেলা
বাগানের সবুজ দাওয়ায়।
পাণ্ডু গাঁদা দু-চারিটি সাদা কুন্দ বেচারীটি
কেঁপে মরে শীতের হাওয়ায়।
প্রজাপতি পথ ভোলা এসে দিয়ে যায় দোলা
সে কেবল উপহাস করা,
মধু-মাছি হেলা ক'রে চলে আন্‌পথ ধরে।
পাবে যেথা মধুর পসরা!
শীতের নরম আলো এদের বেসেছে ভালো
সারাদিন চেয়ে আছে মুখে,
সাঁজের শীতল বয়ে, আদর করিয়া যায়
তুলে যেন নিতে চায় বুকে!

অনুশীলনী

১। প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলো।
২। সমার্থক শব্দ জেনে নিয়ে পাশে লেখো:
দাওয়া: ——। পাণ্ডু: ——। মধু-মাছি: ——।
৩। কবিতাটি পড়ে শীতের সকালের বর্ণনা দাও।

৬/১

বাংলা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ



স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২): কলকাতার শিমুলিয়া অঞ্চলের নরেন্দ্রনাথ দত্তই পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত হন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন আইনজীবী; মাতা — ভুবনেশ্বরী দেবী। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ নরেন্দ্রনাথের মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ জাগান। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন।

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতে সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই কথা বলেছেন সাধারণ লোকের ভাষায়। যা অপ্রাকৃত, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না?

স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কী হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর — সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর?

স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি ভাষা কোনো কালে হবে না।

ভাষাকে করতে হবে — যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর — আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা — সংস্কৃত গদাই-লস্করি চাল — ঐ একচাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। সে কি ধুম! দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে —'রাজা আসীৎ' !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !!!

ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল।

অনুশীলনী

১। 'স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কী হবে?'
— স্বাভাবিক ভাষা কী? অস্বাভাবিক ভাষাই বা কী?

২। চলিত ভাষার কী কী গুণ?

৩। ভাষার মরে যাওয়ার লক্ষণ কী?

৪। মানে বলো:

লোকহিতায়, কল্পিত, কিম্ভূতকিমাকার, গদাইলস্করি, চাল, ধুম।

শঙ্খমালার ছড়া

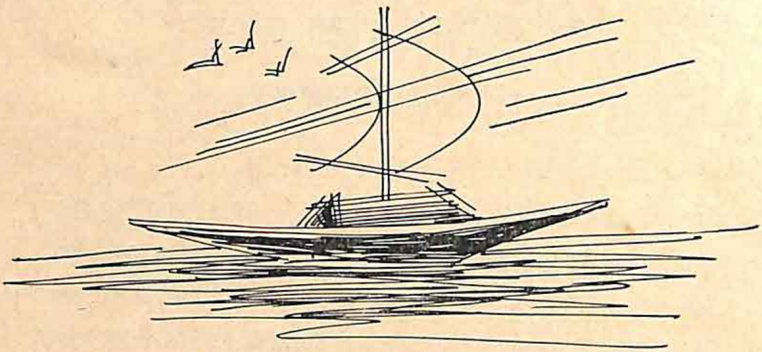
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭ - ১৯৫৭): জন্ম — উলাইল, ঢাকা। পিতা — রমদারঞ্জন। দশ বছর ধরে দক্ষিণারঞ্জন খুঁজে বের করেছেন বাংলার সেই সব প্রচলিত গল্প, রূপকথা যেগুলি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। তারপর সেই সব গল্প থেকে মালমশলা নিয়ে ছোটদের জন্য লিখেছেন অপূর্ব সব রূপকথা — 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'-তে যা ভরা আছে। প্রতিটি গল্পের ভূমিকা লিখেছেন ছড়ায় ; এই ছড়াটি তার মধ্যে একটি।

প্রাচীন ভারতে বাংলাদেশের সওদাগরেরা ডিঙ্গা সাজিয়ে সাগরে পাড়ি দিত। জোয়ারে - ভাটায় কখন নৌকো ছাড়তে হয় সেই কথা প্রথম ছড়ায় বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ছড়ায় রয়েছে নাবিকের মা-বোনের মঙ্গলব্রতের বর্ণনা। মা কাঁদেন আর তাঁর হাত কাঁপে নৌকো-ডুবির ভয়ে ; বোন হাসে আর তার হাত নাচে এই আশায় যে বোন লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ফিরবে। তৃতীয় ছড়ায় আছে দ্রুতগামী রাজহংসরূপী চৌদ্দডিঙ্গার বর্ণনা। চতুর্থ ছড়ায় নাবিকের মা-বোনের অবস্থা ফেরার কাহিনী।

না নড়ে বাতাস, না নড়ে দিক
উজান ভাটির বাতাস ঠিক।
সেই বাতাস পবন
তখন নায়ের গমন ॥

মা আলপনা থুইয়া কাঁদেন,
বোন আলপনা দেয় হাসে।
মা চৌদ্দ ডিঙা বরণ করেন হাত কাঁপে,
বোন চৌদ্দ ডিঙা বরণ করে হাত নাচে ॥



প্যাঁক প্যাঁক ডাক ছাড়ে।
রাজহংস পাখা নাড়ে।
ছয়মাসের পথ দণ্ডে গেল
যেন পুষ্পকের রথ ॥

একদিন দেখিলাম বন-কুড়ুলি
পরনে দেখিলাম ছালা।
আজ এসেছেন শাড়ীর ঘেরণ
গলায় ঢুলিয়া মালা ॥

অনুশীলনী

১। এক নম্বর ছড়ায় 'উজান ভাটির বাতাস ঠিক' বলতে কি বোঝাচ্ছেন কবি?

২। 'বোন আলপনা দেয় হাসে' — কেন?

৩। 'যেন পুষ্পকের রথ।'
— কি পুষ্পকের রথের মত চলছে? বর্ণনা দাও।

৪। শেষের ছড়াটি পড়ে তোমার কী মনে হয়?

৫। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়তে তোমার ভালো লাগে কেন?

ঠুকে-মারি আর মুখে-মারি

সুকুমার রায়

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) : জন্ম — কলকাতা। বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। যেমন লিখতেন সুন্দর, ছবিও আঁকতেন তেমনি চমৎকার। বহু ছড়া, গল্প, নাটক, গান, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন হাসির রসে ভরিয়ে — পড়তে ছোট বড় সবারই ভাল লাগে।

গায়ের জোরকে বুদ্ধির জোর দিয়ে কেমন হারানো যায়, তারই সরস বর্ণনা এই গল্পটি।

মুখে-মারি পালোয়ানের বেজায় নাম, — তার মত পালোয়ান নাকি আর নাই। ঠুকে-মারি সত্যিকারের মস্ত পালোয়ান, মুখে-মারির নাম শুনে সে হিংসায় আর বাঁচে না। শেষে একদিন ঠুকে-মারি আর থাকতে না পেরে, কম্বলে নব্বুই মণ আটা বেঁধে নিয়ে, সেই কম্বল কাঁধে ফেলে মুখে-মারির বাড়ি রওয়ানা হলো।

পথে এক জায়গায় বড্ড পিপাসা আর ক্ষিদে পাওয়ায় ঠুকে-মারি কম্বলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা ডোবার ধারে বিশ্রাম করতে বসল। তারপর চোঁ-চোঁ করে এক বিষম লম্বা চুমুক দিয়ে ডোবার অর্ধেক জল খেয়ে বাকি অর্ধেকটায় সেই আটা মেখে নিয়ে সেটাও সে খেয়ে ফেলল। শেষে মাটিতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

সেই ডোবাতে একটা হাতি রোজ জল খেতে আসত। সেদিনও সে জল খেতে এল ; ডোবা খালি দেখে তার ভারি রাগ হলো। পাশেই একটা মানুষ শুয়ে আছে দেখে সে তার মাথায় দিল গোদা পায়ের এক লাথি ! ঠুকে-মারি বলল, 'ওরে, মাথা টিপেই দিবি যদি, একটু ভাল করে দে' না বাপু !' হাতির তখন আরো বেশি রাগ হলো। সে শুঁড়ে করে ঠুকে-মারিকে তুলে আছাড় মারতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ঠুকে-



এই বলে সে হাতিটাকে ছুঁড়ে তাদের উঠানে ফেলে দিল।

মারি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে হাতি-মশাইকে থলের মধ্যে পুরে রওয়ানা হলো।

খানিক দূরে গিয়ে সে মুখে-মারির বাড়িতে এসে হাজির হলো আর বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগল, 'কই হে মুখে-মারি! ভারি নাকি পালোয়ান তুমি! সাহস থাকে তো লড় না এসে!' শুনে মুখে-মারি তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছনের এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মুখে-মারির বৌ বলল, 'কর্তা আজ বাড়ি নেই। কোথায় যেন পাহাড় ঠেলতে গিয়েছেন।' ঠুকে-মারি বলল, 'এটা তাকে দিয়ে ব'লো যে এর মালিক তার সঙ্গে লড়তে চায়।' এই বলে সে হাতিটাকে ছুঁড়ে তাদের উঠানে ফেলে দিল।

ব্যাপার দেখে বাড়ির লোকের চক্ষুস্থির! কিন্তু মুখে-মারির সেয়ানা খোকা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ও মা গো! দুষ্টু লোকটা আমার দিকে একটা ইঁদুর ফেলেছে! কি করি বল তো?' তার মা বলল, 'কিছু ভয় নেই। তোমার বাবা এসে ওকে উচিত শিক্ষা দেবেন। এখন ইঁদুরটাকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।'

এই কথা বলা মাত্র ঝাঁটার ঝট্‌পট্ শব্দ হলো আর ছেলেটা বলল, 'ঐ যা! ইঁদুরটা নর্দমায় পড়ে গেল।' ঠুকে-মারি ভাবল, 'যার খোকা এরকম, সে নিশ্চয়ই আমার উপযুক্ত জুড়ি হবে।'

বাড়ির সামনে একটা তাল গাছ ছিল, সেইটা উপড়ে নিয়ে ঠুকে-মারি হেঁকে বলল, 'ওরে খোকা, তোর বাবাকে বলিস্ যে আমার একটা ছড়ির দরকার ছিল, তাই এটা নিয়ে চললাম।' খোকা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'ওমা দেখেছ? ঐ দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।' খড়্কে কাঠি শুনে ঠুকে-মারির চোখ দুটো আলুর মত বড় হয়ে উঠল। সে ভাবল, 'দরকার নেই বাপু, ওসব লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে!' সে তখনই হন্ হন্ করে সে গ্রাম ছেড়ে নিজের গ্রামে পালিয়ে গেল।

মুখে-মারি বাড়িতে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে! লোকটা

গেল কই ?' খোকা বলল, 'সে ঐ তাল গাছটা নিয়ে পালিয়ে গেল।' 'তুই তাকে কিছু বললি না ?' 'নিয়ে গেল, তা আমি আর তাকে বলব কি ?' এই কথা শুনে মুখে-মারি ভয়ানক রেগে বলল, 'হতভাগা! তুই আমার ছেলে হয়ে আমার নাম ডোবালি ? দরকার হলে দুটো কথা বলতে পারিস্‌নে ? যা! আজই তোকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব।' এই বলে সে অপদার্থ ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দিতে চলল।

কিন্তু গঙ্গা তো গ্রামের কাছে নয়—সে অনেক দূর। মুখে-মারি হাঁটছে হাঁটছে আর ভাবছে, ছেলেটা যখন কান্নাকাটি করবে, তখন তাকে বলবে, 'আচ্ছা এবার তোকে ছেড়ে দিলাম।' কিন্তু ছেলেটা কাঁদেও না, কিছু বলেও না, সে বেশ আরামে কাঁধে চড়ে 'গঙ্গায়' চলেছে। তখন মুখে-মারি তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'আর দেরি নেই, এই গঙ্গা এসে পড়ল বলে।' ছেলেটা চট্‌ ক'রে বলে উঠল, 'হ্যাঁ বাবা। বড্ড জলের ছিটা লাগছে।' শুনে মুখে-মারির চক্ষুস্থির! সে তখনই ছেলেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, 'শিগগির বল্‌, সত্যি ক'রে, লোকটাকে তুই কিছু বলেছিস্‌ কিনা ?' ছেলে বলল, 'ওকে তো আমি কিছু বলিনি। আমি মাকে চেঁচিয়ে বললাম, দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্‌কে-কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।' মুখে-মারি এক গাল হেসে তার পিঠ থাব্‌ড়ে বলল, 'সাবাস্‌ ছেলে! বাপ্‌কা বেটা!'

অনুশীলনী

১। 'সাবাস্‌ ছেলে! বাপ্‌কা বেটা!' — কে বলল ? কেন বলল ?

২। 'কিছু ভয় নেই। তোমার বাবা এসে ওকে উচিত শিক্ষা দেবেন। এখন ইঁদুরটাকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।'

— কে বলেছিল ? 'তোমার বাবা' কে ? 'ওকে' বলতে কাকে ?

৩। 'ওরে মাথা টিপেই দিবি যদি...' — কে বলেছিল ? কাকে ?

৪। বাক্য তৈরি করো :

চুমুক, গোদা, চক্ষুস্থির, সেয়ানা, হেঁড়ে গলা, নর্দমা, খড়কে কাঠি।

মুখোশ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৭-১৯৩৭) : পৈতৃক নিবাস — ২৪ পরগণার নাতরা গ্রামে, জন্ম — মাতুলালয় জয়নগরে। পিতা — নন্দলাল দেবসরকার। প্রথম জীবনে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিশুদের উপযোগী ছড়া ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। 'হাসিখুশি' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

নীল গগনে চাঁদের হাসি জগৎ আলো করে ;
তার সে হাসি ঢাকতে কি চাঁদ মুখোশ কভু পরে ?
বনে বনে অযুত গোলাপ ফুটে যখন থাকে,
কেউ কি তাদের মুখের হাসি মুখোশ দিয়ে ঢাকে ?
ভোর না হতে সোনার উষা মাতিয়ে তোলে ধরা
কে দেখেছে তার সে মুখে এমনি মুখোশ পরা ?
চাঁদের মত, ফুলের মত, উষার মত আলো,
মুখোশ দিয়ে ঢাকলে খোকা দেখায় কি সে ভাল ?
দাও ফেলে ভাই মুখোশ, মুখে উঠুক ফুটে হাসি,
ঐ হাসিতে ডুবে মোরা সুখ-সাগরে ভাসি।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বলো।

২। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের আর যে সব ছড়া তুমি পড়েছো, তার থেকে একটি আবৃত্তি করো।

৩। অভিধান দেখে সমার্থক শব্দ বার করো :

চাঁদ, গগন, গোলাপ, উষা, সাগর।

৪। বাক্য তৈরি করো :

চাঁদের হাসি, মুখোশ, ভোর, মাতিয়ে, সুখ-সাগরে।

ধ্বনি-বিচার

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯): মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার চৈঁসাবিদ্যাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা—গোবিন্দপুর, মাতা—চন্দ্রকামিনী দেবী। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ হন রামেন্দ্রসুন্দর এবং বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব দেখান।

বাঁশী বাজাইলে বাঁশীর ভিতরে আবদ্ধ বাতাসটা কাঁপিয়া উঠে এবং ভিতরের কম্প বাহিরে আসিয়া বাহিরে বায়ুরাশিতে ঢেউ জন্মায়। সেই ঢেউগুলি কানে আসিয়া ধাক্কা দেয় ও সেখানকার স্নায়ুযন্ত্রে পুনঃপুনঃ আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্বনির বোধ হয়।

সেকেণ্ডে কতগুলি ঢেউ আসিয়া কানে আঘাত দেয়, তাহার সংখ্যা গণনা করা চলে। সংখ্যা গণিয়া দেখা গিয়াছে, সেকেণ্ডে দু'শ পাঁচ-শ দু'হাজার দশ হাজার বাতাসের ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিলে ধ্বনিজ্ঞান জন্মে।

সেকেণ্ডে দু'দশটা মাত্র ঢেউ কানে লাগিলে ধ্বনিজ্ঞান জন্মে না, আবার সেকেণ্ডে লাখখানেক ঢেউ লাগিলেও ধ্বনিজ্ঞান জন্মে না। ঢেউয়ের সংখ্যাভেদে ধ্বনি কোমল বা তীব্র হয়।

সেকেণ্ডে পাঁচ-শ ঢেউ কানে লাগিলে যে ধ্বনি শোনা যায়, হাজার ঢেউ লাগিলে ধ্বনি তার চেয়ে তীব্র হয়; স্বরটা একগ্রাম উঁচুতে উঠে। প্রতি সেকেণ্ডে আঘাতের সংখ্যা যতই বাড়ে, ধ্বনি ততই উঁচুতে—কড়িতে উঠে, আর সংখ্যা যত কমে, ততই কোমল হয়।

পিতলের ঘড়িতে হাতুড়ির আঘাত দিলে ঢং করিয়া শব্দ হয়। ঐ 'ঢং' শব্দের 'ঢং' টুকুতে কোন মাধুর্য নাই। কঠিন ধাতুফলকে কাঠের হাতুড়ির আঘাতে যে এলোমেলো কাঁপুনি ক্ষণেকের মত জন্মে, এই

কর্ণজ্বালাকর 'ঢং'টা তাহারই ফল। তবে এই এলোমেলো অনিয়মিত কম্প থামিয়া গেলে ধাতুফলকটা আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া বেশ নিয়মিত ভাবে কাঁপিতে থাকে ; তখন 'ঢং'-এর 'ঢ'টুকু চলিয়া গিয়াছে ; উহার 'অং'টুকু তখনও চলিতেছে। এই 'ঢ'টুকু কর্কশ কিন্তু 'অং'টুকু বেশ মধুর।

শব্দশাস্ত্রে বলে, ঐ 'ঢং' শব্দটার মধ্যে দ্বিবিধ ধ্বনি আছে ; একটা ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি, আর একটা স্বরবর্ণের ধ্বনি। 'ঢং'-এর অন্তর্গত ক্ষণস্থায়ী 'ঢ' টুকু ব্যঞ্জনবর্ণ, আর স্থায়ী 'অং' টুকু স্বরবর্ণ। ঐ ব্যঞ্জনটুকু কর্কশ, আর স্বরটুকু মধুর।

অনুশীলনী

১। আমাদের কানে কেমন ক'রে ধ্বনির বোধ হয় ?

২। ধ্বনি কখন কড়ি আর কখন কোমল হয় ?

৩। পাশে সমার্থক শব্দ বসাও ঃ

ধ্বনি —। পুনঃ পুনঃ —। ধাক্কা —। এলোমেলো —। তীয়র —। মাধুর্য —।

৪। জেনে নিয়ে চলিত রূপ লেখো (যেমন, হইল = হ'ল, তাহার = তার, করিয়া = ক'রে) ঃ

বাজাইলে, বাহিরে আসিয়া, লাগিলে, বলিয়া, গিয়াছে।

বিলাতফের্তা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) : নদীয়ার কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ দেওয়ান বংশে জন্ম। পিতা — দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, মাতা — প্রসন্নময়ী দেবী। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করেন। কবি ও নাট্যকার হিসাবে বিখ্যাত। তাঁর বহু হাসির গানও খুবই জনপ্রিয়।



আমরা বিলাতফের্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা' — আর
মুটেদের ডাকি 'কুলি'।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।

২। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেকালের বিলাতফের্তাদের নিয়ে ঠাট্টা করেছেন কেন? 'সেজেছি বিলাতি বাঁদর' বলতে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন?

৩। সমার্থক শব্দ লেখো :

বিলাত —। সাহেব —। স্বদেশী —। আচার —। জবাই —। বেয়ারা —। কুলি —। আদর —। চাদর —। বিলাতি —।

কাঁচায় পাকায়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১): জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গুণেন্দ্রনাথের পুত্র। কর্মজীবনে কলকাতার সরকারী চিত্রকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি সেখানে যোগ দেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর যেমন খ্যাতি, সাহিত্যরচনাতেও তেমনই সুনাম। অবশ্য, তাঁর রচনাতেও তিনি যেন কথার ছবি এঁকেছেন।

'কাঁচায় পাকায়' বাদশা-বেগমের অদ্ভুত মনোভাব সম্পর্কে একটি মজার গল্প।

বাদশার আগাগোড়া পাকা দাড়ির মাঝে একটি মাত্র কাঁচা ও বেগমের সব কাঁচা চুলের মধ্যে একটি পাকা চুল দেখা যায়। বেগমের কিছুতেই পছন্দ হয় না বাদশার দাড়ি — তা যতই কেন বাদশা আতর কস্তূরীতে দাড়ি মাজুন। ওদিকে বেগমসাহেবা — তিনিও মাথায় হীরে মুক্তোর ঝাপটা সিঁথি পরে, মাথা ঘষা মেখেও সেই একগাছি পাকা চুল বাদশার চোখ থেকে ঢেকে রাখতে পারেন না। দুজনে দুজনকে দেখে মুখ ফেরান, দুজনেই মনের দুঃখে থাকেন। শেষে এমন হল যে, বাদশার দরবারে কাঁচা দাড়ি আর বেগমের দরবারে পাকা চুল যাদের তাদের টেকাই দায় হল। কবি আসে, কালোয়াৎ আসে, ছবিওয়ালী আসে, চুড়িওয়ালী আসে, কেউ খাতির পায় না, উল্টে বরং ধমক খায়, গালি খায়, সরে পড়ে প্রাণ নিয়ে। উজির ভেবেই অস্থির — কি উপায় করা যায়! নাপিত-নাপ্তিনীকে উজির ডেকে বলেন — তোরা সাঁড়াশি দিয়ে চুল দু' গাছা উপড়ে দে, আপদ চুকুক। হাজাম হাজামিন দুজনে ভয়ে শিউরে উঠে বলে — দোহাই উজির সাহেব, এমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না — সাঁড়াশি দিয়ে আমাদের দাঁত উপড়ে ফেলতে বলেন তো পারি, বাদশা-বেগমের উপর অস্তর চালাই এমন নেমকহারাম আমরা নই! উজির নিঃশ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে বসেন! — কি উপায়!

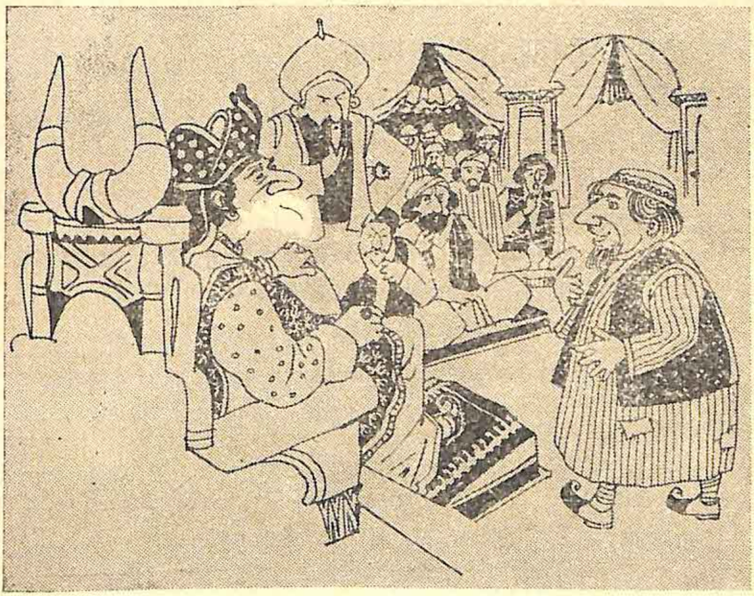
মোল্লা দোপেঁয়াজ পেঁয়াজ রসুন খেতে বড়ই ভালোবাসেন, কিন্তু হাতে পয়সা নেই মাসকলাই কেনবারও। ফতোয়া দেন মসজিদে দু-বেলা ; কোন ফল হয় না। তাঁর বিবি তাঁকে বলেন — দেখ এই সময় বাদশা-বেগমকে খুশি করতে পার তো কিছু হতে পারে।

মোল্লা দোপেঁয়াজ বল্লেন — তা জানি, পেঁয়াজও হতে পারে, পয়জারও হতে পারে।

বিবি বল্লেন — দেখ না চেষ্টা ক'রে। কিছু না হওয়ার চেয়ে সে-ও যে ভালো।

মোল্লা সকালে কোমর বেঁধে মজলিসে হাজির! দেখেন সবাই যে যার দাড়ি মোচড়াচ্ছেন আর চুপ ক'রে বসে আছেন। এমন কি, যার দাড়ি গোঁফ কিছুই নেই সেও হাত বোলাচ্ছে শুধু গালের ওপরটাতেই। নাচ গান আমোদ আহ্লাদ সব বন্ধ!

বাদশা মোল্লার দিকে চাইতেই মোল্লা মস্ত এক সেলাম ঠুকলেন, কিন্তু বাদশার উচ্চবাচ্য নেই। তখন মোল্লা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে



৬/২

যেভাবে ফতোয়া দেয় লোকে, সেই ভাবে সুর ক'রে গান শুরু করলেন দাড়ি নেড়ে, যথা —

'আব্ দাড়ি চাপ্ দাড়ি,
চুলবুল চস্‌মেদার,
কুল পক্কা এক কাচ্চা
ওহি দাড়ি সবসে আচ্ছা।'

বাদশা খুশি হয়ে তালে-তালে ঘাড় নাড়ছেন দেখে দোপেঁয়াজ আবার গাইলেন —

'এক দাড়ি মান মনোহর
এক দাড়ি ভবেবা
এক দাড়ি খালিফ্ ফজিহৎ
এক দাড়ি ঠট্‌টো
সদর পাকা অন্দর কাচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা!'

শুনে-শুনে বাদশা একগাল হেসে ফেললেন, সেই সময় অন্দরেও হাসির রোল উঠলো, পর্দার আড়ালে! এক সঙ্গে বাদশা বেগম আমির ওমরা এবং শহরে কাঁচা পাকা যে কেউ খুশি হয়ে গেল। মোল্লার আর প্যাঁজ রসুন ধরে না ঘরে।

অনুশীলনী

১। বাদশাকে বেগমের, বেগমকে বাদশার কেন পছন্দ হচ্ছিল না?
২। উজির নাপিত-নাপ্তিনীকে কী বললেন? তারা রাজী হল না কেন?
৩। মোল্লা দাড়ির যে গান শোনালেন, সেটা মুখস্থ বলো।
৪। সমার্থক শব্দ বেছে ফাঁক পূরণ করো:

নাপ্তিনী,	রাজসভা,	মন্ত্রী,	নাপিত,	বেইমান,
সম্রাট,	জুতো,	রানী,	নির্দেশ,	সেরা।

হাজাম —। দরবার —। উজির —। পয়জার —।
হাজামিন —। নেমকহারাম —। ফতোয়া —।
বাদশা —। বেগম —। সবসে আচ্ছা —।

গ্রীষ্ম

সুকুমার রায়

এই লেখকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর পরিচয় হয়েই গেছে তাঁর গল্পের মাধ্যমে। এটি তাঁর ছড়ার একটি নিদর্শন।

সর্বনেশে গ্রীষ্ম এসে বর্ষশেষে রুদ্রবেশে
আপন ঝোঁকে বিষম রোখে আগুন ফোঁকে ধরার চোখে।
তাপিয়ে গগন কাঁপিয়ে ভুবন মাতল তপন নাচল পবন।
রৌদ্র ঝলে আকাশতলে অগ্নি জ্বলে জলেস্থলে।
ফেলছে আকাশ তপ্ত নিশাস ছুটছে বাতাস ঝলসিয়ে ঘাস
ফুলের বিতান শুকনো শ্মশান যায় বুঝি প্রাণ, হায় ভগবান।
দারুণ তৃষায় ফিরছে সবায় জল নাহি পায়, হায় কি উপায়,
তাপের চোটে কথা না ফোটে হাঁপিয়ে ওঠে ঘর্ম ছোটে।
বৈশাখী ঝড় বাধায় রগড় করে ধড়ফড় ধরার পাঁজর,
দশদিক হয় ঘোর ধূলিময় জাগে মহাভয় হেরি যে প্রলয়,
করি তোলপাড় বাগান বাদাড় ওঠে বারবার ঘন হুঙ্কার,
শুনি নিয়তই থাকি থাকি ওই হাঁকে হৈহৈ মাভৈ মাভৈঃ।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।

২। কবিতাটি পড়ে তোমার কেমন লেগেছে তা সংক্ষেপে লেখো।

৩। অভিধান দেখে সমার্থক শব্দ বার করো :

পবন, ভুবন, তপন, পাঁজর, প্রলয়।

৪। বাক্য তৈরি করো :

সর্বনেশে গ্রীষ্ম, আপন ঝোঁকে, জলেস্থলে, বাধায় রগড়, মাভৈ মাভৈঃ।

শ্রীচৈতন্য

কালিদাস রায়

কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) : বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামের এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। পিতা — যোগেন্দ্রনারায়ণ, মাতা — রাজবালা দেবী। দর্শনে এম.এ. পাস ক'রে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা — সবই লিখেছেন। তাঁর রচনায় বৈষ্ণবভাবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'কবিশেখর' উপাধি লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে একটি বিষয় খুব স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সমাজে জাত্যভিমানের বিষ অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছিল। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রকৃত ভক্তগণ সকলেরই শ্রদ্ধেয় ও নমস্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্মানুশীলনে, ধর্মশিক্ষায় এবং গুরুপদের গৌরবে ব্রাহ্মণেরই একাধিপত্য আর রহিল না।

আচণ্ডাল সর্বজাতির লোকের সহিত একত্র নাম-সংকীর্তনে, শূদ্রাধমের সহিত আলিঙ্গনে, নীচজাতীয় ভক্তের পদধূলিগ্রহণে, সকলের সহিত একত্র ভোজনে, উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-গ্রহণে উচ্চজাতীয় ভক্তগণ বারবারই নিজেদের জাত্যভিমানকে পদদলিত করিয়াছেন — এইরূপই দেখা যায়। শূদ্র ভক্ত শালগ্রাম-পূজারও অধিকার পাইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব স্বমুখেও নীচজাতীয় ভক্তদের আশাতীত মর্যাদা দান করিয়াছেন। যবন হরিদাসকে প্রভু আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছেন —

'তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে।
নিরন্তর ধর্মশাস্ত্র কর অধ্যয়ন।'

শ্রীচৈতন্যেরই মুখের কথা —

'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অন্য পথে চলে···।'



মোটের উপর মনুষ্যত্বের বিচারে জাতিকুলের কোন মূল্যই নাই, চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিই একমাত্র বিবেচ্য — সমগ্র সমাজে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কত বড় দান, বর্তমান যুগের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই তাহা বুঝেন।

অনুশীলনী

১। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সমাজে কীভাবে জাত্যভিমানের বিষ অনেকটা মন্দীভূত হয়েছিল, তার বর্ণনা দাও।

২। শ্রীচৈতন্য যবন হরিদাসকে আলিঙ্গন ক'রে কী বলেছিলেন?

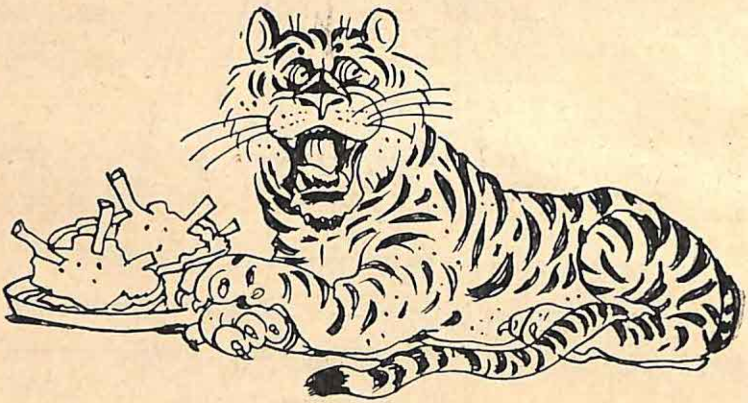
৩। মানে লেখো :

মন্দীভূত, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে, জাত্যভিমান, একাধিপত্য, আলিঙ্গন, নিরন্তর, অধ্যয়ন, বিপ্র, সঞ্চারিত।

বাঘে মানুষে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ঃ জন্ম — জোড়াসাঁকো, কলকাতা। পিতা — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গান, কবিতা, ছড়া, নাটক, উপন্যাস, গল্প — কত যে লিখেছেন তা গুনে শেষ করা যায় না। তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নিজের গানে সুরও তিনি নিজেই দিয়েছেন ; সৃষ্টি ক'রে গেছেন বহু নৃত্যনাট্য যা আজও সবাই দেখতে ভালোবাসে। দেশকেও ভালোবাসতেন আর ভালোবাসতেন পড়াশুনা। তাই প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন 'বিশ্বভারতী'।



সুঁদর বনের কেঁদো বাঘ,
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ
যথাকালে ভোজনের কম হলে ওজনের
হত তার ঘোরতর রাগ।

একদিন ডাক দিল গাঁ গাঁ,
বলে তোর গিন্নীকে জাগা,

শোন্ বটুরাম ন্যাড়া,   পাঁচ জোড়া চাই ভেড়া,
এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু বলে, এ কেমন কথা,
শিখেছ কি এই ভদ্রতা!
এত রাতে হাঁকাহাঁকি   ভালো না, জানো না তা কি,
আদরের এ যে অন্যথা।

মোর ঘর নেহাৎ জঘন্য,
মহাপশু, হেথায় কি জন্য!
ঘরেতে বাঘিনী মাসী   পথ চেয়ে উপবাসী
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।

সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাং,
অন্তত ভাজা কোলা ব্যাং।
আছে বাসি খরগোশ,   গন্ধে পাইবে তোষ,
চলে যাও নেচে ড্যাং ড্যাং।

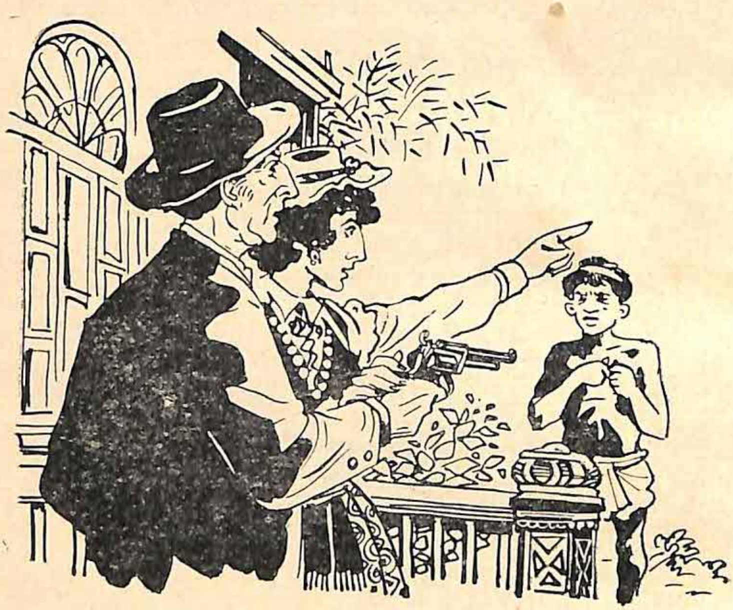
অনুশীলনী

১। 'বাঘে-মানুষে' — এখানে মানুষ কে বা কারা?
২। বাঘকে বটুরাম কী বলেছিল?
৩। সমার্থক শব্দ লেখো:
বাঘ, দাগ, রাগ, ভেড়া, অন্যথা, জঘন্য, ঘর, অন্ন, তোষ, উপবাসী।
৪। বাক্য তৈরি করো:
ঘোরতর, হাঁকাহাঁকি, জোড়া, যথাকাল।

স্বাধীনতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১): জন্ম — লাভপুর, বীরভূম। বহু ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। বেশির ভাগই বড়দের জন্য হলেও, ছোটদের কথাও তিনি মনে রেখেছিলেন। সুন্দর লেখার জন্য তিনি 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'স্বাধীনতা' গল্পে বলতে চেয়েছেন — সব মানুষ যতদিন না সমাজে সম্মান পাবে, ততদিন দেশের স্বাধীনতা যথার্থ হবে না।



আকাল ছিল দূরে দাঁড়িয়ে, সে ছুটে এল, 'বাবা গো !'

সাহেব তার দিকেও তুলল পিস্তল। কিন্তু মেমসাহেব এসে তার হাত ধরল। আকালকে বলল, 'ভাগো, ভাগো !'

আকাল ছুটে পালিয়ে এল।

দেশে রটে গেল, আকালের বাপ কুঠির টাকা চুরি করে পালিয়েছে। থানায় থানায় হুলিয়া হল। লাশ কোথায় গেল কে জানে!

বয়লার-খালাসি বলেছিল, 'বয়লারের মধ্যে পুরে দিয়েছিল। সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে ছিল পিস্তল হাতে।'

— বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে?

হাসপাতালে হাঁপাতে হাঁপাতে আকাল বলল, 'এর শোধ নিতে আমিও করেছিলাম ডাকাতের দল। কিন্তু কুঠি চড়াও হবার মতো দল ভারি হবার আগে, দু'চারটে বন্দুক জোগাড় করবার আগেই কুঠি উঠে গেল। কিন্তু কুঠির সাহেবদের জাতেরা দেশে থাকল। বাবুরা যখন তাদের তাড়াবার জন্য সভা করল, তখন ভগবানকে ডাকলাম, — ভগবান! মুখ তুলে চাও!

'আজ ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। সাহেবরা চলে যাচ্ছে। আজ আমি লাফাতে চাইলাম, আমোদ করতে চাইলাম। কিন্তু গায়ে বল নাই, বুকে দম নাই।

'তবে, আর বাঁচতে সাধ নাই। যাতে মরে যাই — তাই কর।'

ডাক্তার বলল, 'কেন! মরবে কেন?'

'মরব কেন? বেঁচে কী করব?'

'স্বাধীন ভারতবর্ষ — '

'স্বাধীন?'

'হ্যাঁ। আর কোন দুঃখ থাকবে না। কেউ আর এমন অত্যাচার করবে না — '

বাধা দিয়ে আকাল বললে, 'করবে না? জমিদার মহাজন চোখ রাঙাবে না? বামুনেরা, ভদ্রজাতেরা ছোটলোক বলে নাক সেঁটকাবে না? তা যদি হয় তো বাঁচাও, নইলে বাঁচিয়ো না। আজ মরলে, সে মরণে সুখ পাব। বাবু?' — প্রশ্ন করল আকাল।

ডাক্তার বলল, 'ঘুমোও এখন।'

অনুশীলনী

১। 'এর শোধ নিতে আমিও করেছিলাম ডাকাতের দল।'

— কে করেছিল? কিসের শোধ নিতে?

২। 'আজ ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।'

— আকাল একথা কবে, কেন বলছে?

৩। 'তা যদি হয় তো বাঁচাও, নইলে বাঁচিয়ো না।'

— কে কাকে একথা বলল? কী ভেবে বলল?

৪। 'বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে?'

— এখানে বাঘ কে? কেন?

৫। মোটা হরফের শব্দগুলি কোন্‌টি কোন্ পুরুষ লেখো:

(ক) **আকাল** বলল, '**আমি** আজ মরলে সুখ পাব।'

(খ) **ডাক্তার** বলল, '**তুমি** এখন ঘুমোও।'

(গ) **সে** ছুটে এসে **আমাকে** সব কথা বলল।

(ঘ) **আমাদের** দেশ **ভারত** এখন আর **ব্রিটিশের** অধীনে নেই।

বাংলাভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) : ঢাকা শহরে জন্ম হলেও পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বিক্রমপুরের মগর গ্রামে। পিতা — ডাঃ রমাপ্রসাদ সেন। অতুলপ্রসাদ আইন পাস ক'রে লক্ষ্ণৌতে ওকালতি করতেন। গীতিকার ও সুগায়ক হিসাবে তিনি সুপরিচিত। নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে এই কবিতাটিতে চমৎকার সুরও দিয়ে গেছেন কবি।

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলাভাষা!
(মাগো) তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা!

কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

এই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তিধারা,
আছে কই এমন ভাষা
এমন দুঃখ শ্রান্তি-নাশা!

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
এই ফুলেরই মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা।

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণ-তীর্থে, মাগো,
জগৎ করে যাওয়া-আসা।

এই ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাক্‌নু মায়ে মা মা বলে,
এই ভাষাতেই বলব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় 'মাগো' বলতে কবি কাকে বোঝাতে চেয়েছেন ?

২। কোন্ 'রবি'-র কথা কবি বলেছেন ? তিনি কী মালা এনেছিলেন ?

৩। জেনে নিয়ে লেখো :

ক) মাঝির গানের নাম কী ?

খ) নিতাই-গোরা কে ?

গ) চতুর্থ স্তবকে কবি কাদের কথা বলেছেন ?

৪। বাক্য তৈরি করো :

গরব, ভালোবাসা, ভক্তিধারা, চরণ-তীর্থ, সাঙ্গ।

৫। 'বলে' আর 'বোলে' শব্দ দু'টিকে লক্ষ্য করো। এদের উচ্চারণ একই, কিন্তু বানান আর মানে আলাদা। এরকম শব্দ আরও পাঁচ-জোড়া ভেবে নিয়ে লেখো।

৬। সুর জেনে নিয়ে গানটি গাও।

প্রতিমা হাসলেন

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৭৬): জন্ম — কলকাতা। বি. এ. পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম হয়ে 'বঙ্কিম পদক' লাভ করেন। ডি. ভি. সি.-র প্রচার বিভাগ, বোম্বাই, দিল্লী ও মস্কোতে কর্মজীবন কাটে। কবি হিসাবেই তাঁর খ্যাতি। কিন্তু শিশুদের জন্য লেখা ও গোয়েন্দা-গল্প রচনাতেও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ছোটদের পত্রিকা 'রংমশাল' সম্পাদনা করেছেন। মানুষকে ভালোবাসলেই দেবতাদের খুশি করা হয় — এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন এই গল্পের মাধ্যমে।



মানুষটির কাঁধে একটা বিরাট ঢাক। বাচ্চা মেয়েটির হাতে একটা কাঁসি। পরনে ছেঁড়া জাঙ্গিয়া। মুখটা কেমন যেন খুশি খুশি। আবার মুখটা যেন কান্না কান্না।

'বাবু-গো, পেন্নাম হই।' বলে সেই ঢাকী ঢাকটা নামিয়ে অমরনাথ বাবুর সামনে প্রায় শুয়েই পড়লো। বাচ্চা মেয়েটি কি করবে ভেবে না পেয়ে ভীতু-ভীতু চোখে আকাশের দিকে তাকালো।

তখন শরৎকালের নীল-নীল আকাশ। আর তার মধ্যে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ।

বাচ্চা মেয়েটির কী মনে হলো, যে-গ্রাম থেকে সে এসেছে সেই গ্রামে এই মেঘগুলোর মতো গরুবাছুর চরে ?

কে জানে ?

রাশভারী মানুষ অমরনাথবাবু। তিনি ঢাকীকে বললেন, 'যে কাঁসর বাজায়, তোর সেই ছেলেটা কোথায় ? — এ মেয়েটাকে কোত্থেকে এনেছিস ?'

ঢাকী আবার গড় হয়ে প্রণাম ক'রে বললো, 'এজ্ঞে' ছেলেটা মরে গেছে। বৌটাও মরে গেছে। এ মেয়েটাই আমার ছেলে — মানে, আমার মেয়ে। আর তো কেউ নেই। এ মেয়েটাই — কি বলবো, বাবু — এটাই আমার মা।' তারপর কড়া গলায় বাচ্চা মেয়েটাকে বললো, 'এই, গড় কর্। বাবুকে পেন্নাম কর্।' তারপর বললো, 'বাবু! মেয়েটা কিন্তু খুব ভালো কাঁসি বাজায়। আপনি দেখে লিবেন — আমি যখন ঢাকে বাজ কড়কড় করছি — মেয়েটার কাঁসিতে তখন ঝিলিক ঝিলিক দিচ্ছে —।'

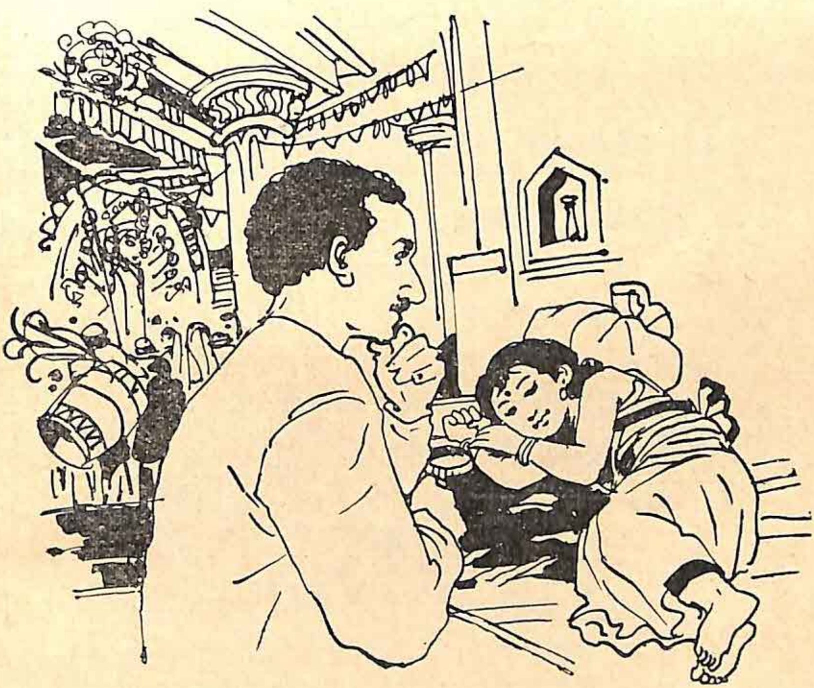
বাবুর বয়স বিরাশি। এই বিরাশি বছর ধরে তিনি শুনে আসছেন — ভালো ক'রে তাকালে সন্ধিক্ষণের পুজোর সময় মাটির প্রতিমা একবার হেসে ওঠেন। এই বিরাশি বছর ধরে তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা মাটির প্রতিমার সেই মুহূর্তের হাসিটি দেখে তিনি তাঁর জীবন ধন্য করেন।

আজ সন্ধিক্ষণ রাত এগারোটা তিপান্ন মিনিটে। বহু লোক। ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার।

অমরনাথবাবু জোড় হাতে দাঁড়িয়ে।

এখানে পাঁঠাবলি হয় না। মস্ত বড় একটা লাউ বলি হয়। ঢাকী প্রাণপণে ঢাক বাজিয়ে চলেছে। পাড়ার অন্য সব ঢাকীদের ঢাকের শব্দও মিশেছে।

হঠাৎ অমরনাথবাবুর মনে হল কি যেন একটা নেই। যেন একটা শব্দ নেই।



অন্য কেউ লক্ষ্য করেনি — তিনি কিন্তু দেখলেন, সেই বাচ্চা কাঁসর-বাজিয়ে মেয়েটির হাত থেকে কাঁসর খসে পড়েছে। সে এক কোণে শুয়ে পড়েছে।

রাগতে গিয়ে তিনি প্রতিমার মুখের দিকে তাকালেন।

মুখটা কি হাসি হাসি !

এখনি তো সন্ধিক্ষণ ।

বাচ্চা মেয়েটির মুখে ঘুমন্ত ক্লান্ত হাসি ।

অমরনাথবাবু উঠে এসে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলেন ।

তাঁর শেষ জীবনে এই প্রথমবার সন্ধিক্ষণে প্রতিমার মুখের কি বিচিত্র অদ্ভুত মিষ্টি হাসি যে তিনি দেখলেন !

আর কেউ দেখলো না ।

চারিদিকে তখন বিকট ঢাকের বাদ্যি ।

অনুশীলনী

১ । ঢাকী কেন বলল, 'এই মেয়েটাই — কি বলবো, বাবু — এটাই আমার মা' ?

২ । 'হঠাৎ অমরমাথবাবুর মনে হলো কি যেন একটা নেই ।'

— কী ছিল না ? বুঝতে পেরে অমরনাথবাবু তাকিয়ে কী দেখলেন ?

৩ । 'আর কেউ দেখলো না ।'

— কী দেখলো না ? একমাত্র কে এই দৃশ্য দেখলেন ?

৪ । গল্পটা পড়ে তোমার কেমন লাগল, দু-চার কথায় লেখো ।

৫ । সঠিক শব্দ যুগ্ম বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো :

খুশি-খুশি, কান্না-কান্না, নীল-নীল, ছেঁড়া-ছেঁড়া, ঝিলিক-ঝিলিক

(ক) — আকাশে ঝিলমিল হাসি ।

(খ) বড়দির কাছে প্রচণ্ড ধমক খেয়ে মেয়েটির মুখ — হয়ে গেল ।

(গ) গরম কালে — পোশাক প'রে ভারি আরাম ।

(ঘ) কালো মেঘে ঢাকা আকাশে বিদ্যুতের — দেখতে আমার ভালো লাগে ।

(ঙ) পুজোর ছুটি এসে গেছে বলে সকলেই — ।

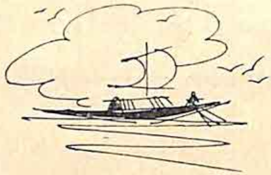
বাসনা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫): নদীয়ার শান্তিপুরে জন্ম। পিতা — নৃসিংহচন্দ্র, মাতা — নিস্তারিণী দেবী। বি. এ. পাস ক'রে তিনি শিক্ষকতা করতেন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা লিখতেন। তাঁর রচনায় কাল্পনিকতা প্রবল। এই কবিতায় নিজের স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে গ্রাম বাংলার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি।



ছুটবো আমি সরল প্রাণে পর্ণ-কুটির হতে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুটবো আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে শুকতারাটি জাগবে দূরে
কান জোড়াবে পাখির গানে সুরের মিঠে স্রোতে।



বুক ফুলায়ে হাল ধরিব পাল তুলিব নায়ে,
মাঝ-গঙ্গায় জাল ফেলিব উদাস আতুল গায়ে।
গাঙ্ চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে
ডাকবে চাতক 'ফটিক জল' মেঘের ছায়ে ছায়ে।



শিল কুড়িয়ে বাঁধব 'মোয়া', লাঙল দেবো ভুঁয়ে,
কড়্ কড়্ কড়্ ডাকবে দেয়া, আসবো আমন রুয়ে।
আকাশ-ভাঙা মুষল-ধার বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়!
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড় পড়বে নুয়ে নুয়ে।



অনুশীলনী

১। 'বাসনা' কবিতায় গ্রামের যে ছবি ফুটে উঠেছে, নিজের ভাষায় তা লেখো।

২। কবিতাটি পড়ে নিচের ফাঁকগুলি ভর্তি করো ঃ

— কুটির।	— নাচানো।	— ফুঁড়ে।
— জুড়াবে।	— গঙ্গায়।	— গায়ে।
— দেয়া।	— রুয়ে।	— ভাঙা।

৩। মানে লেখো ঃ

পর্ণ, আলিপথ, আদুল, ভুঁয়ে, দেয়া, মুষল, নুয়ে।

৪। বাক্য রচনা করো ঃ

মাঠের হাওয়া, মিঠে স্রোত, ঝাঁকে ঝাঁকে, ফটিক জল, ঝাউয়ের ঝাড়।

ছেলেবেলা

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-   ) : জন্ম — উড়িষ্যার ঢেঙকানালে। অবসর প্রাপ্ত আই. সি. এস.। ছোট-বড় সবার জন্যই প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছড়া লেখেন। এই অংশে নিজের ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি।

আমার জন্ম ওড়িশার একটি ছোট্ট দেশীয় রাজ্যে। তার নাম ঢেঙকানাল। খুবই ছোট রাজ্য। তবু ওখানে রাজা ছিল, রাণী ছিল। আর ছিল অফিস আদালত রাজকর্মচারী — সবই। রাজা ছিলেন অত্যন্ত উদার হৃদয়। শিক্ষিত সজ্জন। সেই জন্যই তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রদেশের লোক।

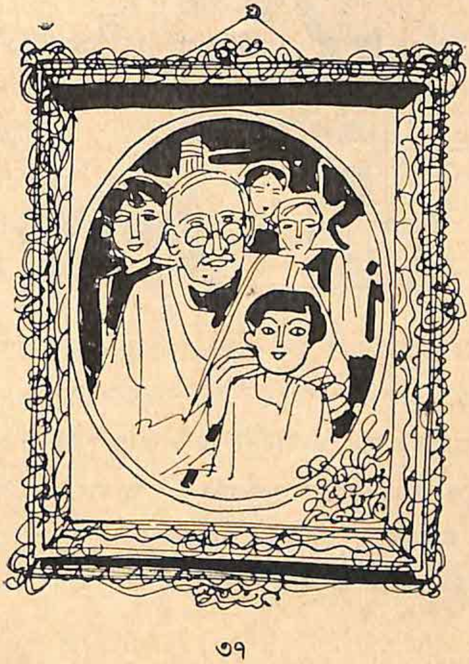
খুব গাছে চড়তে পারতুম। সকালবেলা গাছে উঠে বসেছি, সন্ধ্যের



আগে নামিনি। হয়ত পেয়ারা গাছে উঠে সারাদিন ধরে কেবল পেয়ারা খেয়েছি। কিংবা, জাম গাছে উঠে, সারাদিন ধরে খেয়েছি কেবলই কালোজাম। দুটো দশটা খেয়ে শখ মিটত না। সাঁতার কাটার ব্যাপারেও ছিল ঐ একই রকমের ঝোঁক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটতুম। পাড়ে ওঠার কথা মনেও থাকত না।

আমাদের বাড়ির পেছনেই একঘর বিহারী মুসলমান বাস করতেন। এখনো করেন। চারদিকে হিন্দুর বাড়ি। অথচ মাঝখানে মুসলমানের বাস। এখন হয়ত অনেকের চোখে এটা বিসদৃশ ঠেকবে, কিন্তু তখনকার দিনে আমাদের চোখে তাই ছিল স্বাভাবিক।

কাছাকাছি একটা বাড়িতে থাকতেন খোন্দকার সাহেব। তাঁকে আমরা বলতুম, পাঠান মাস্টার। তিনি ছিলেন হাইস্কুলের শিক্ষক। বাড়ি খুলনা জেলায়। কিন্তু ওঁর স্ত্রী ছিলেন উর্দু-ভাষিণী। আশ্চর্য সরল মানুষ। কথায়-বার্তায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে মাস্টারমশাই ছিলেন বাঙালী হিন্দুর মতো।



আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে কম বয়সের যে ফটোগ্রাফ, সেটিতে আমি বসে আছি মাস্টার মশাইয়ের কোলে।

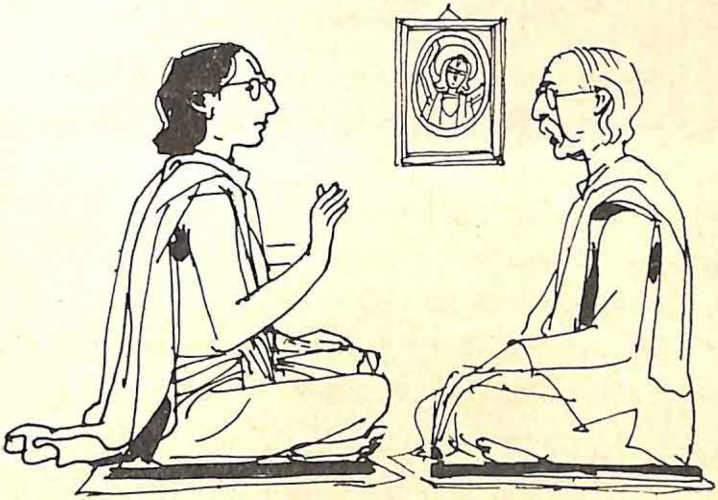
বাবার বন্ধুদের মধ্যে আতাহার মিঞাকে বেশ মনে আছে।

অত্যন্ত দিলদরিয়া ও রসিক প্রকৃতির মানুষ। আমাদের জন্য হালুয়া নিয়ে আসতেন। সে রকম সুস্বাদু হালুয়া আর কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।



আমার বাবা প্রথমে ছিলেন শাক্ত। পরে বৈষ্ণব হয়ে যান। কিন্তু মুসলমান, খৃস্টান, ব্রাহ্ম, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মেলামেশা অব্যাহত ছিল। প্রতিবেশী বিহারী মুসলমান বৃদ্ধ ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। নিজের বাড়িতে তিনি কোরান পড়তেন। বাবা পড়তেন বৈষ্ণব শাস্ত্র।

মাঝে মাঝে দেখতুম, বাবার সঙ্গে তিনি ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উভয় ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করছেন।



মহরমের সময়টা ছিল বেশ আনন্দের।

শহরের মুসলমানরা আমাদের বাড়িতে এসে বাজনা খেলা দেখিয়ে যেত। তাদের সঙ্গে থাকত হিন্দুরাও।

শিরিয়া নামের একটি ছেলের কথা মনে পড়ে।

মহরমের জৌলুসে সে বাঘ সাজত। আমি খুব উপভোগ করতুম। ইচ্ছে হত, আমিও বাঘ সাজি। কিন্তু প্রকাশ্যে সে সাহস হত না। তখন মনে মনে কতো যে বাঘের নাচ নেচেছি!

আমার ঠাকুরমা মানত করেছিলেন, আমিও একদিন মহরমে লাঠি খেলব। সে মানত পূর্ণ হয়নি। ভাবতেও অবাক লাগে, দুই ধর্ম কতো কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

অনুশীলনী

১। 'ভাবতেও অবাক লাগে দুই ধর্ম কতো কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।'

— কোন্ কোন্ ধর্ম ? এই দুই ধর্মের সম্প্রীতির কী কী উদাহরণ লেখক দিয়েছেন ?

২। লেখকের ছেলেবেলা কোথায় কেটেছে ? সে জায়গার বর্ণনা দাও।

৩। লেখা থেকে নিয়ে নিচের ফাঁকা জায়গা ভর্তি করো ঃ

(ক) দুটো দশটা খেয়ে — মিটত না।

(খ) আমাদের বাড়ির পেছনেই একঘর — মুসলমান বাস করতেন।

(গ) — সময়টা ছিল বেশ আনন্দের।

(ঘ) — নামের একটি ছেলের কথা মনে পড়ে।

(ঙ) আমার — মানত করেছিলেন।

৪। লেখকের কাছে কেন স্মরণীয় বলো ঃ

পাঠান মাস্টার, আতাহার মিঞা, বাবা, শিরিয়া।

আজব বটে

সুনির্মল বসু

সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭): পৈতৃক নিবাস—ঢাকার মালখানগর, কিন্তু জন্ম পিতা পশুপতির কর্মস্থল গিরিডিতে। সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেন। শিশুসাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

পাগল মশাই, পাগল,—
দিন রাত্তির ঘুমায় পড়ে বাসায় দিয়ে আগল।
ফাজিল মশাই, ফাজিল,—
ডাক শুনে মোর দৌড়ে এলো ডিঙিয়ে উঁচু পাঁচিল।



বিকট মশাই, বিকট,—
আমায় দেখে চোখ রাঙিয়ে আসলো তেড়ে নিকট।
বেকুব মশাই, বেকুব,—
চম্‌কে দিল, রাষ্ট্র-ভাষায় ধমকে দিয়ে সে খুব।
বাতুল মশাই, বাতুল,—
জানে না সে আমি যে তার গ্রাম-সুবাদে মাতুল।
নীরেট মশাই, নীরেট,—
আমি জানাই—'মাতুল আমি, আমার বাড়ি জিরেট।'

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ করো।

২। কবি যার সম্পর্কে বলছেন, সে কবির কে হয়? তাকে কী কী বিশেষণ দিয়ে কবি ব্যাখ্যা করেছেন?

৩। সমার্থক শব্দ লেখো:

পাগল ——। ফাজিল ——। বেকুব ——। বিকট ——। বাতুল ——।

৪। বাক্য তৈরি করো:

পাঁচিল ডিঙিয়ে, রাঙিয়ে, রাষ্ট্র ভাষায়, নীরেট, মাতুল।

৫। মিল দাও:

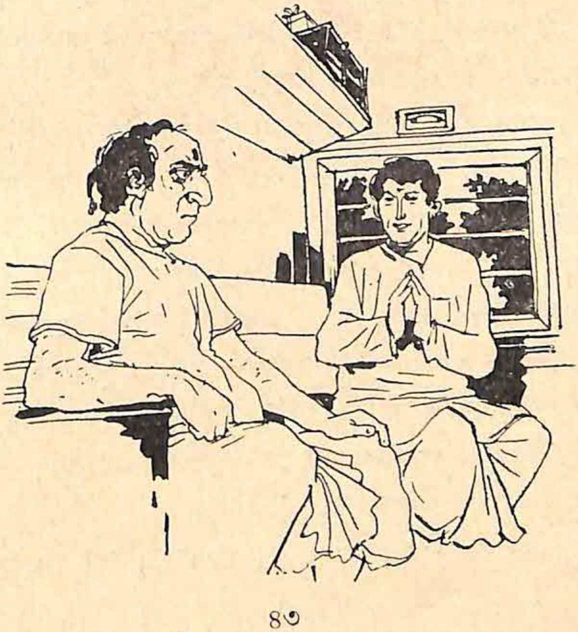
মশাই, আমার, রাঙিয়ে, তেড়ে, আমি।

কুশী প্রাঙ্গণে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬-   ) ঃ হুগলি জেলার চাতরায় পৈতৃক নিবাস। জন্মস্থান — দ্বারভাঙ্গা, বিহার। পিতা — বিপিনবিহারী, মাতা — গিরিবালা। এখনো বিহারেই বাস করেন। বহু গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন।

লোকটি মান্‌সী থেকেই আমার দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, — প্রথমত তাঁর চেহারার জন্যে, দ্বিতীয়ত তাঁর গালাগালের জন্যে। এতকাল এদেশে আছি, এমন একটি আদর্শ মৈথিল ব্রাহ্মণের চেহারা এর আগে কখনও চোখে পড়েনি। টকটক করছে রং; মুখের ছাঁচটা গোল; প্রশস্ত কপাল; শান্ত, আয়ত চক্ষু; সুপুষ্ট শিখা একটি মোটা গ্রন্থিতে বেশ গুছিয়ে বাঁধা; ভ্রূর মাঝখানটিতে একটি বেশ বড় সিন্দুর-বিন্দু। পরনে



গোলাপী রঙের থান কাপড়, গোটানো কোঁচাটি নাভিকুণ্ডের কাছে গোঁজা; একটি ফিনফিনে পাতলা পিরানের নীচে হলদে রঙের পৈতে যাচ্ছে দেখা।

মান্‌সীতে আমি যখন গাড়ি বদল ক'রে এই গাড়িতে আসি, উনি একলা একটি কোণে চুপ ক'রে ছিলেন বসে। ঢুকেই মনে হল সূর্যের কড়া আলোরও অতিরিক্ত একটা আলো যেন রয়েছে গাড়িটার মধ্যে; কতকটা ধাতস্থ হতেই আমার হাত দুটি গিয়ে কপালে জড়ো হল, বললাম — 'প্রণাম পণ্ডিতজী।'

ঐ বেঞ্চটাতেই মাঝামাঝি গিয়ে বসলাম।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হল একটু। পণ্ডিতজী প্রণামের উত্তরে মাথাটা একটু নোয়ালেন বটে, কিন্তু মুখটা বেশ স্পষ্টভাবেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠল, বসলেনও খানিকটা গুটিসুটি মেরে — আরও খানিকটা কোণ ঘেঁসে। একটু অস্বস্তিতেই পড়লাম। তখনও আকৃষ্টই রয়েছে মনটা, কিন্তু হঠাৎ এত বীতরাগ কেন? আচরণটা এতই অদ্ভুত মনে হল যে, খানিকটা ইতস্তত ক'রে জিগ্যেস ক'রেই ফেললাম — 'পণ্ডিতজী, আমি আসায় কী আপনার কোনো অসুবিধে হল? তাহলে না হয় নেমেই যাই।'

পণ্ডিতজী হাত দুটো বুকের দুদিক দিয়ে উঁচু ক'রে তুলে (মৈথিলদের মুদ্রা একটা) বেশ স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গেই বললেন — 'হয়েছে বাঙালী-বাবু, হয়নি বললে মিথ্যাচারী হব। কথাটা হচ্ছে আপনারা বড্ড ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন। আর সব কথা থাক, আচ্ছা, ঐ কী একটা মুখে দিয়ে ফক্‌ফক্ করে ফুঁকে যাচ্ছেন বলুন তো? একটা ম্লেচ্ছ নেশা, ক্রমাগতই হাত উচ্ছিষ্ট হচ্ছে — তার ওপর এই দুর্গন্ধ — গাড়িতে ঢুকেছেন পর্যন্ত...'

মুখের সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে বললাম — 'নিন, আপনি বৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ, এ সামান্যর জন্যে কেন অসুবিধায় ফেলব; আর হাত উচ্ছিষ্ট হবার কথাও যদি বলেন...'

— প্ল্যাটফর্মের দিকে চাইলাম, অদূরেই জলের কলটা, নেমে গেলাম।

হাত-মুখ ধুয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখি পণ্ডিতজী ছোট একটি কয়েৎ-বেলের মতো ডিবে উপুড় ক'রে বাঁ-হাতে নস্যি ঢালছেন!

অনুশীলনী

১। 'এমন একটি আদর্শ মৈথিল ব্রাহ্মণের চেহারা এর আগে কখনও চোখে পড়েনি।' — লেখক এই ব্রাহ্মণের চেহারার কী বর্ণনা দিয়েছেন?

২। পণ্ডিতজী কেন অপ্রসন্ন হয়েছিলেন? তাঁর নিজের কথা উদ্ধৃত ক'রে জবাব দাও।

৩। নিচের সমার্থক শব্দগুলো জায়গামতো বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

গড়ন, হরিদ্রা, বর্ণ, টানা, উপবীত, টিকি, বাড়তি, ফোঁটা, বিরক্ত, অনাচারী, গিঁট, চওড়া

শিখা ——। রঙ ——। অতিরিক্ত ——। আয়ত ——।
ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ——। বিন্দু ——। পৈতে ——। ছাঁচ ——।
বীতরাগ ——। হলদে ——। গ্রন্থি ——। প্রশস্ত ——।

ধনপতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) : মাত্র একুশ বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেই ছোট বড় সবার জন্য লিখে গেছেন বহু চমৎকার ছড়া আর কবিতা।

ধনপতি পাল তিনি জমিদার মস্ত ;
সূর্য রাজ্যে তাঁর যায় নাকো অস্ত,
তার ওপর ফুলে ওঠে কারখানা-ব্যাঙ্কে
আয়তনে হারালেন মোটা কোলা ব্যাংকে।
সবার 'হুজুর' তিনি, সকলের কর্তা,
হাজার সেলাম পান দিনে গড়পড়তা।
সবাই পাহারা দেয় বাইরে সেপাই তাঁর,
কাজ নেই, তাই শুধু 'খাই খাই' বাই তাঁর,
এটা খান, সেটা খান, সব লাগে বিদ্ঘুটে,
টান মেরে ফেলে দেন একটু খাবার খুঁটে ;
খাদ্যে অরুচি তাঁর, সব লাগে তিক্ত,
খাওয়া ফেলে ধমকান শেষে অতিরিক্ত।
দিনরাত চিৎকার : আরো বেশি টাকা চাই।
সব ভয়ে জড়োসড়ো, রোগ বড় প্যাঁচানো,
খাওয়া ফেলে দিনরাত টাকা বলে চ্যাঁচানো।

অনুশীলনী

১। প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলো।
২। ধনপতি পাল সম্বন্ধে যা জানতে পারলে লেখো।
৩। শেষ চারটি লাইন থেকে ধনপতির চরিত্রটি তুমি কী ভাবে বুঝেছো ?
৪। বাক্য তৈরি করো :
গড়পড়তা, খাইখাই, বিদ্ঘুটে, অরুচি, তিক্ত, অতিরিক্ত, ধমকান।

খোকন আর উদ্‌ বেড়াল

ননীগোপাল মজুমদার

ননীগোপাল মজুমদার (১৮৯৫-১৯৫৮) : যশোহরের দেবরাজপুরে জন্ম। পিতা — বরোদাপ্রসন্ন। উচ্চশিক্ষালাভের পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও বিভিন্ন প্রত্নশালায় দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক রূপেই তাঁর প্রধান পরিচয় এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলায় খনন ক'রে তিনি প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেন। ছোটদের জন্য কিছু মজার গল্পও লিখে গেছেন।

খোকনদের বাড়িতে জামাইবাবু এসেছে। জামাইবাবু এলে যেন সবাই পাগলের মতো করতে থাকে। সবাই তাকে নিয়ে কি ব্যস্ত! — খোকনের দিকে তাকিয়েও দেখে না।

মনের দুঃখে খোকন মেনীকে নিয়ে চলে গেল মাছ ধরতে — দু-একটা মাছ ধরতে পারলে যদি বাড়িতে তার আদর বাড়ে!

অনেক কষ্টে — মানে, খোকনের বন্ধু-বান্ধবদের খেলার ডাক, ভুবনদের ঘুড়ি কাটাকাটি, রাস্তায় বাজীওয়ালার ম্যাজিক — এ সব ভালো ভালো জিনিসের থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে খোকন এসে বসল পুকুরপাড়ে — আজ তাকে মাছ একটা ধরতেই হবে।

খোকন বসে আছে তো বসেই আছে ফাৎনার দিকে চোখ লাগিয়ে, কিন্তু আজ মাছগুলো হয়েছে কি দুষ্টু! — একবারও খোকনের বঁড়শিতে ঠোঁট লাগায় না।

বসে বসে খোকনের পা ধরে গেছে। সে দাঁড়িয়ে প্রথমে পা দুটো আকাশের দিকে ছুঁড়ে নিল, যেন ফুটবল কিক করছে, হাত দুটো মাথার উপর তুলে গায়ের আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল, তারপর ডাকল, 'মেনী'…।

মেনীর দিকে তাকিয়ে দেখল যে সে চোখ বুঁজে কি সব স্বপ্ন দেখে

মিট মিট ক'রে হাসছে। — কুঁড়ের বাদশা, ঘুমুক! — খোকন ভাবল। কিন্তু খোকন কী করে? ফাৎনা নট্ নড়ন চড়ন নট্ কিচ্ছু!

ঘুম তাড়াবার জন্য খোকন গান ধরল — 'উদ্‌বেড়ালে খুদ খায়, চালে নাচে ফিঙে।'

যেই-না খোকন ছড়াটা বেশ মজা ক'রে গানের সুরে বেঁধেছে, অমনি পুকুর পাড়ের একপাশ থেকে একটা জন্তু বেরিয়ে, লাফিয়ে এসে খোকনের সামনে দাঁড়াল, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'কী বললে?'



খোকন তো হাঁ — সে কতদিন মাছ ধরতে এসেছে, এমনটা তো কখনও সে দেখেনি। এ কে বাবা! ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখল যে তার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় আড়াই হাত একটা জন্তু, বাদামী রং, মাথা ও মুখ চ্যাপ্টা, ছোট ছোট পা, আঙুলগুলি আবার পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। হঠাৎ জন্তুটাকে দেখে খোকন হকচকিয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়েছিল ভয়ে, — একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তু-তুমি কে?' — খোকন ভয় পেলে একটু তোৎলা হয়ে যায়।

জন্তুটা বলল, 'বাঃ, চালাকি হচ্ছে ? এতক্ষণ আমার নামে যা-তা বলা হচ্ছিল, এখন আবার বলা হচ্ছে "তুমি কে" ?'

খোকন বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই এ উদ্‌বেড়াল। সে বলল, 'ও, তুমি উদ্‌বেড়াল ?'

উদ্‌বেড়াল বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এ নামেই মানুষেরা আমায় জানে। আরও কত নামই যে আমার আছে! — অনেকে তো আমাদের ভোঁদড় বলেই ডাকে।'

খোকন বলল, 'তা-তা আমি তোমার নামে যা-তা বলতে যাবো কেন ?'

উদ্‌বেড়াল প্রায় তেড়েই উঠল, বলল, 'যা-তা বলো নি ? — বলোনি যে উদ্‌বেড়ালে খুদ খায় ?'

খোকন খুব অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা তো বলেছি। সে তো আমাদের ছড়াতেই আছে, "উদ্‌বেড়ালে খুদ খায়, চালে নাচে ফিঙে"।'

উদ্‌বেড়াল খেঁকিয়ে বলল, 'আহা কথার কি ছিরি! জানা নেই, শোনা নেই, যার তার নামে যা-তা বললেই হল ?'

খোকন বলল, 'বাঃ রে, আমি যা-তা বলতে যাবো কেন ? আমাদের ছড়াতেই আছে, "উদ্‌বেড়ালে খুদ খায়" —

উদ্‌বেড়াল ছাতের সমান লাফ দিয়ে বলল, 'আবার আবোল তাবোল বকছো ?'

খোকন একটু অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে তুমি বলতে চাও যে তুমি খুদ খাও না ?'

উদ্‌বেড়াল বলল, 'আমি কেন খুদ খেতে যাবো ? আমার কী খাবারের আকাল হয়েছে ?'

খোকন ছড়া মুখস্থ করেছে, 'উদ্‌বেড়ালে খুদ খায়', আর এ এখন বলে কী ? — ছড়া কী কখনও ভুল হতে পারে ? সে প্রায় চটেমটে বলল, 'তা হলে তুমি কী খাও ?'

'কী খাই ?' বলে উদ্‌বেড়াল এক ডিগ্‌বাজি খেয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে

পড়ল — আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মাছ মুখে ক'রে এনে তার মাথাটা আর পেটটা খেয়ে ফেলে দিয়ে, আবার ডিগ্‌বাজি খেয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উঠে এল মুখে আর একটা মাছ নিয়ে!

খোকনের চোখ তো ছানাবড়া। সে এক ঘণ্টা ধরে ছিপ নিয়ে বসে আছে, একটা মাছও তার টোপে পর্যন্ত এল না। আর এ একটার পর একটা মাছ ধরে আনছে! — এমনি ভাবে পাঁচ-ছটা মাছ ধরবার পর —

খোকন বলল, 'আরে থামো, থামো, লোকে মাছ খেতে পায় না, আর তুমি এ ভাবে মাছ নষ্ট করছ?'

উদ্‌বেড়াল বলল, 'নষ্ট করব কেন?' — বলে চুক চুক ক'রে মুখ দিয়ে শব্দ করল, অমনি তার গর্ত থেকে চার-পাঁচটা বাচ্চা উদ্‌বেড়াল বেরিয়ে এসে বলল, 'মাছ কই, মাছ কই?'

ধেড়ে উদ্‌বেড়াল আর খোকন চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, সত্যিই তো কোনো মাছ নেই — এত মাছ গেল কোথায়?

খোকনের কেমন সন্দেহ হল। সে ধমকের সুরে ডাকল, 'মেনী!'

মেনী এক চোখ বন্ধ ক'রে সামনের পা দিয়ে মুখ মুছে ফ্যাঁক ফ্যাঁক ক'রে হাসতে লাগলো।

অনুশীলনী

১। খোকন কেন মাছ ধরতে গেল?
২। খোকন কী গান গেয়েছিল?
৩। উদ্‌বেড়ালের আরেক নাম কী?
৪। উদ্‌বেড়াল রেগে গেল কেন?
৫। উদ্‌বেড়ালের ধরা মাছগুলো কে খেল?

বুড়ো রাজার খুড়ো

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-): জন্মস্থান — বারাণসী। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য — সব রকম রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'ঘনাদা'র কাহিনীগুলি কিশোর পাঠকদের বিশেষ প্রিয়।

এক যে ছিল বুড়ো রাজা
একেবারে থুড়থুড়ো,
পাত সাজিয়ে বসত খেতে
রুই কাৎলার মুড়ো।
আহা, চিবোয় কিসে!



আহা চিবোয় কিসে, দাঁত গিয়েছে
ফোকলা শুধু মাড়ি,

চুষতে কাঁটা গলায় বিঁধে
ঘুচল দুনিয়াদারি।

বাজাও ড্যাং ড্যাঙা ড্যাং
আরে বাজবে কিসে, ঢোলই ফুটো !
ফুটো করল কে ?
তালাস নে !

বুড়ো রাজা নেই তাতে কি,
আছে যে তার খুড়ো ;
রাজবাড়িটা ভেঙেই খুড়োর
উঠছে দালান চুড়ো !
খুড়ো খুব সেয়ানা।

খুড়ো খুব সেয়ানা যায় না জানা
কখন কি ভোল ধরে,
চোরের সাথে চুরি করে
কোটাল হয়ে ধরে।
খুড়োর তল পাওয়া ভার।

অনুশীলনী

১। প্রথম ন' লাইন মুখস্থ ক'রে বলো।
২। বুড়ো রাজার খুড়োর যে 'তল পাওয়া ভার'·তা কী ভাবে বোঝা যায় ?
৩। মানে লেখো :
খুড়থুড়ো, কোকলা, দুনিয়াদারি, তালাস, সেয়ানা, কোটাল।
৪। মিল দাও :
চুড়ো —। মাড়ি —। ঘুচল —। ফুটো —। চুরি —।

কলকৌশলের গল্প

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-   ) ঃ জন্ম — কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা — ক্ষিতীশচন্দ্র। খুব অল্প বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু। আজও লিখে চলেছেন — কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ — বড়দের জন্য আর ছোটদেরও জন্য। এই প্রবন্ধে মজা ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যন্ত্রপাতি মানুষের শক্তিকে কত বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে।

একটা আম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যদি আমি বলি, এবার আমি একটা ম্যাজিক দেখাব — সবাই খুব খুশি হবে। তারপর একটা আঁকশি হাতে নিয়ে যখন বলব, এটা হল আমার জাদুদণ্ড — সবাই হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু আঁকশিটা হাত দিয়ে ধরে যখন আমি উঁচু একটা ডাল থেকে আম পেড়ে আনব, সবাই বেজায় চটে যাবে। ম্যাজিক দেখাবার নামে লোক-ঠকানো!

আঁকশি দিয়ে আম পাড়ার মধ্যে সত্যিই কী অবাক হবার কিছু নেই? যে ডালে আমার হাত যায় না, সেই ডালের আম ফুস্‌মন্তরে আমার হাতে এসে গেল। মাটিতে দাঁড়িয়ে শুধু হাত বাড়িয়ে কেউ পেড়ে আনুক তো দেখি!

আমার হাত যতদূর ওঠে, তার চেয়েও পাঁচ হাত উঁচু থেকে আমটা আমি পেড়ে আনলাম। দেখতে আঁকশি হলে কি হয়, ওটা আমার বাড়তি পাঁচটা হাতের কাজ ক'রে দিচ্ছে। যখন আমি আঁকশিটা হাতে নিচ্ছি, তখন বুঝতে হবে নিজের হাতের সঙ্গে আরও পাঁচটা বাড়তি হাত আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। একটা হাতের জায়গায় হয়ে গেল আমার ছ'টা হাত। ম্যাজিক নয়ত কি!

এতেও যদি লোকে খুশি না হয়, আর একটা খেলা দেখাচ্ছি।

এই যে দূরবীনটা, এটা হল আমার আরেকটা জাতুদণ্ড। সিকি-মাইল দূরে ঐ মাঠটার মধ্যে একজন টুপি-পরা লোক বসে আছে। ঠিক কিনা একজন কেউ ছুটে গিয়ে দেখে আসুক।

আর কেউ চোখ থেকেও তা দেখতে পাচ্ছে না। লোকটা পঞ্চান্ন গজ দূরে বসে থাকলে সবাই দেখতে পেত। কিন্তু সিকি-মাইল দূরের জিনিস দেখতে গেলে আরও আট-জোড়া চোখের দরকার। দূরবীন দিয়ে আমি সেই বাড়তি আট-জোড়া চোখের কাজ করিয়ে নিচ্ছি।

এই যে নিজেকে আমি দরকার মতন বাড়িয়ে ফেলছি, এটা কী অবাক হবার মতো ব্যাপার নয় ?

এখানে জাতুকরের চেয়ে যারা দেখছে, তাদেরই বেশি কেরামতির দরকার। যে শুধু আঁকশিটাই দেখে, পাঁচটা হাত দেখতে পায় না — তার ম্যাজিক দেখা হয় না। দূরবীনটাকে আট-জোড়া চোখ হিসেবে যে দেখতে পায়, বলতে হবে তারই ম্যাজিক দেখার চোখ আছে।

ম্যাজিকের কথা থাক।

আচ্ছা, একটা নতুন ধরনের অলিম্পিক করলে কেমন হয় ? তাতে পৃথিবীর সব জাতের জীব একজন ক'রে প্রতিযোগী পাঠাবে। কিন্তু ঘোড়ার সঙ্গে যদি দৌড়ে পাল্লা দিতে হয়, হাতির সঙ্গে কুস্তি লড়তে হয়, বাঘের সঙ্গে লং-জাম্প্ দিতে হয় — তাহলে কি হাল হবে ভেবে দেখ ! তাতে মানুষের বরাতে ঘুঁটের মেডেলও জুটবে কিনা সন্দেহ। তুনিয়ার সামনে মানুষের মাথা একদম হেঁট হয়ে যাবে।

গায়ের জোরে কাবু হলে কি হয়, উল্টে মানুষই কিন্তু ঘোড়াকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, হাতির পিঠে চড়ে বসছে, বাঘকে খাঁচায় পুরে বাজারের কেনা মাংস খাওয়াচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ যে পৃথিবীতে এত বড় হয়েছে তা গায়ের জোরে নয়।

গায়ের জোর ছাড়াও এক রকমের জোর আছে, তাকে বলে কলকৌশলের জোর। শুধু হাতে মানুষের এমন কিছু জোর নেই, কিন্তু

একটা পাথর তুলে নিতেই অমনি জোর বেড়ে গেল। পাথরটা ভারী হলে এক রকমের জোর, ছুঁচলো হলে আরেক রকমের জোর হবে।

মানুষ যা চায়, প্রকৃতির উপর নানারকমের জোর খাটিয়ে তা আদায় করে নেয়। পড়ে পাওয়া জিনিসে তার অভাব মেটে না। যা দিয়ে প্রকৃতির ওপর জোর খাটানো হয়, তাকে বলে কলকাঠি। সেসব নাড়াবার কায়দা থাকে। কলকাঠি যে নাড়াতে পারে না সে-ই হল আনাড়ি।

যদি কেউ ভাবে, পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর সবাই আনাড়ি — তাহলে ঠিক হবে না।

তাই বলে পিঁপড়ে, মৌমাছিদের মোটেই কিন্তু কেজো প্রাণী বলা যায় না। তারা যা কিছু করে, স্বভাবের তাড়নায় করে। অনেকটা দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত।

অনুশীলনী

১। 'নিজেকে আমি দরকার মতন বাড়িয়ে ফেলছি।'
— কী ভাবে? একটা দৃষ্টান্ত দাও।

২। গায়ের জোরের চেয়ে বড় জোর কিসের? তার একটা উদাহরণ দাও।

৩। পিঁপড়ে বা মৌমাছিকে কেন 'কেজো প্রাণী' বলা যায় না?

৪। বাক্য তৈরি করো:
বেজায়, ফুস্‌মন্তর, দূরবীন, কেরামতি, কাবু, আনাড়ি।

৫। বিশেষণের বিশেষণ পদ বসিয়ে ফাঁক ভর্তি করো:
(ক) আঁকশি হল যেন — বাড়তি হাত।
(খ) — টুপি-পরা লোক বসে আছে।
(গ) কীটপতঙ্গেরা — কলের পুতুলের মতো কাজ করে।
(ঘ) এবারে — নতুন টীম নিয়ে খেলা হবে।
(ঙ) দূরের জিনিস দেখতে হলে — জোরালো চোখ দরকার।

চলব আমি হাল্কা চালে

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬) : বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায়। পিতা — কাজী ফকির আহম্মদ, মাতা — জাহোদা খাতুন। কবিতা ও গানের মাধ্যমে তিনি বাংলা কাব্যে জাগরণ আনেন। কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন। শেষ বয়সে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতা চলে যায়। ঢাকায় পরলোক গমন করেন। সহজ-সরল জীবন-যাপনের পক্ষে ছিলেন নজরুল। সেই কথাই ছন্দে গেঁথে বলেছেন এই কবিতায়।

চলব আমি হাল্কা চালে
পল্কা খেয়ায় হাওয়ার তালে,
কুসুম যেমন গন্ধ ঢালে
তরল সরল ছন্দে রে।

যেমন চলার ছন্দ লুটে
চন্দ্র ডোবে সূর্য উঠে,
সন্ধ্যা সকাল সমীর ছুটে
যেমন সে আনন্দে রে।

নাই বা হলাম মস্ত ভারী
নাই হল ঘর লাখদুয়ারী
বিশটে ঘোড়া দশটা দ্বারী
ভিড় সে দেওয়ান গোমস্তার।

ভারিক্কি কি! উঠতে গেলে
স্কন্ধে ক'রে তুলবে ঠেলে
মূর্তি দেখেই ছুটবে ছেলে,
চাইনে সে ভার, নমস্কার।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বলো।

২। শেষের আট লাইনে কবি কী বলতে চেয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

৩। সমার্থক শব্দ লেখো ঃ

পলকা —। কুসুম —। তরল —। ভারী। দুয়ারী —।

৪। বাক্য তৈরি করো ঃ

দেওয়ান, ভারিক্কি, নমস্কার, আনন্দ, ছন্দ।

লম্বোদরের তিন ছেলে

সাগরময় ঘোষ

সাগরময় ঘোষ (১৯১২-   ): জন্ম—কুমিল্লা জেলার বাজাপ্তি গ্রামে। পিতা — কালীমোহন। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক। লেখেন অল্প, কিন্তু সাংবাদিক হিসাবে যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন — তার সার্থক প্রকাশ ঘটে লেখায়।

স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদর মৃত লম্বোদর ভট্টাচার্যের তিন পুত্র। এমনিতে প্রায় অর্ধাশনেই দিন কাটাচ্ছিল। দেশ ভাগের পর তারা ভৌমিক-বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজনের সাত দিন আগে থেকে পুরো অনশনে থেকে গেল। বহুকাল পর পিতৃনাম রক্ষার সুযোগ পেয়েছে তিন ভাই। তাদের সঙ্কল্প, দশ গাঁয়ের লোক যেন একবাক্যে বলতে পারে — হ্যাঁ, লম্বোদরের উপযুক্ত বংশধর বটে।

ভোজনের দিন প্রাতঃকালে স্নান সেরে পূজার্চনাদি সমাধার পর কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে নতুন ধুতি ও চাদর পরে ছাঁদা বাঁধবার জন্য তিনজনে তিনটি নতুন গামছা মাথায় চাপিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল।

ভৌমিক-বাড়ি চালতাতলি থেকে মাইল আষ্টেক হাঁটা পথ। এবারে গ্রামবাসীরা ব্রাহ্মণ-ভোজন দেখবার জন্য সঙ্গে কেউ আর গেল না। তারা জানে, এটা নিতান্তই অভাবের দিনের ভোজন; এখানে রেযারেষি ক'রে, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কোন ব্রাহ্মণই ভোজন করতে যাচ্ছেন না। সুতরাং খাওয়া দেখে উৎফুল্ল হওয়ার ব্যাপারই এটা নয়।

গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত এসে গ্রামবাসীরা তিন ভাইকে বিদায় দিয়ে বলল — তোমরা লম্বোদর ভট্টাচার্যের উপযুক্ত বংশধর, পিতার অন্তিম বাসনা তোমরা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে। তাছাড়া চালতাতলি গ্রামের সুনামও তোমরা রেখে আসবে আশা করি।

স্থির হল, ব্রাহ্মণ ভোজন যখন দ্বিপ্রহরে তখন সূর্যাস্তের আগেই তিনভাই ফিরে আসবে, গ্রামবাসীরা গ্রামের সীমান্তে ওদেরই প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় থাকবে।

দুপুর পেরিয়ে বিকেল হল। সূর্য তখন প্রায় পশ্চিমপ্রান্তে হেলে পড়েছে। গ্রামের পুব প্রান্তের বড় বকুল গাছের তলায় গ্রামবাসীরা দল বেঁধে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে তিন ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের। কারোর দেখা নেই।

সূর্য যখন প্রায় ডোবে ডোবে তখন সহসা দেখা গেল দূর থেকে একজন অতিকষ্টে হেঁটে আসছে। মুখটা আকাশের দিকে তোলা, পথের উপর দৃষ্টি ফেলবার উপায় নেই। একটা অর্ধচেতন দেহ কোনরকমে থপ্ থপ্ ক'রে হেঁটে এগিয়ে আসছে। গ্রামবাসীরা ছুটল সেদিকে। এ নিশ্চয় তিন ভাইয়ের এক ভাই। কাছে গিয়ে দেখল, ছোট ভাই কৃশোদর। আকণ্ঠ এমন খাওয়াই খেয়েছে সে মাথাটা নিচু করতে পারছে না, আকাশের দিকে মুখ রেখেই সে হাঁটছে। কৃশোদরকে তার দুই দাদা স্ফীতোদর ও বৃকোদরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে কোনরকমে হাতের ইসারায় পিছনের পথটা দেখিয়ে দিলে, কথা বলার মত শক্তিও তখন তার নেই।

গ্রামবাসীরা বুঝে নিল যে, পিছনে তার দুই ভাই আসছে। ছোট ভাইয়ের অবস্থাই যখন এই, তখন অপর দুই ভাইকে কি অবস্থায় দেখবে সেই কৌতূহল নিয়েই গ্রামবাসীরা এগিয়ে চলল। মাইল খানেক যাওয়ার পর দেখতে পেল জন সাত-আট লোক একটা খাটিয়া কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে। কাছে আসতেই দেখা গেল সে আর কেউ নয়, মেজোভাই বৃকোদর প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় খাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে, ভৌমিক-বাড়ির কয়েকজন যণ্ডামার্কা পাল্‌কি-বেহারা তাকে বহন ক'রে নিয়ে আসছে।

চিৎকার ক'রে গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করল বড় ভাই স্ফীতোদরের কথা। সে কোথায়?

বৃকোদরের মুখেও কোনো কথা নেই। সে শুধু অতি কষ্টে ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে আঙুল দেখিয়ে পথের নির্দেশ দিল। অর্থাৎ পরলোকে গেলেই দেখতে পাবে।



উৎকণ্ঠা নিয়ে আরো খানিকটা পথ এগিয়ে যাবার পর গ্রামবাসীরা দেখতে পেল, একটা বটগাছের তলায় ফাঁকা জমিতে একটা চিতা জ্বলছে, চিতার ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার। সূর্যও তখন অস্তাচলে।

অনুশীলনী

১। 'বহুকাল পর পিতৃনাম রক্ষার সুযোগ পেয়েছে তিন ভাই।' — এই তিন ভাই আর তাদের পিতার পুরো নাম কী ?

২। ভৌমিক-বাড়ি কোন্ গ্রামে ? ওদের গ্রাম থেকে কত দূরে ?

৩। ব্রাহ্মণ ভোজনের পর তিন ভাইয়ের কার কী দশা হল ?

বিদ্যাসাগর

শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-   ): বাংলাদেশের চাঁদপুরে জন্ম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কবিতা ও কবিতা সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে শিক্ষার বিকাশে তাঁর অবদানের দিকটিই বিশেষ ক'রে তুলে ধরেছেন লেখক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যখন বিদ্যাসাগর পড়ান, তখনকার ঘটনা।



সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের আমলে সব চাইতে বড় পরিবর্তন এল শিক্ষার পদ্ধতিতে।

যা-ই শেখাও, সোজা ক'রে শেখাও।

রেওয়াজ ছিল—সংস্কৃত পড়াবে তো খাস 'মুগ্ধবোধ' ধরো। কিন্তু ছাত্রদের কি যে কষ্ট ঐ বই পড়ে ভাষা আয়ত্ত করতে! হাজার হোক, একটা নূতন ভাষা তো।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধরে পড়লেন, সংস্কৃত শিখবো। বিদ্যাসাগর বললেন, বসো, তোমার জন্যে একটা সহজ উপায় ঠাওরাতে হচ্ছে। আজ নয়, কাল এসো।

পরদিনই তৈরি হল নতুন এক সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাংলায় সেটাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে পাওয়া গেল 'উপক্রমণিকা', আর তারপর বড় ক'রে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' বাংলায় লেখা।

দেবভাষাকে এমন ক'রে অপবিত্র করা! পণ্ডিতেরা ভারি চটে গেলেন। কিন্তু কে কান দেয় সে কথায়!

ছ-মাসেই ব্যাকরণ আয়ত্ত হল রাজকৃষ্ণবাবুর। কলেজেও ধরানো হল এই বই।

কী কী পড়ানো হবে, এই আরেক প্রশ্ন।

প্রথম তো ভালো ক'রে ইংরেজি পড়া দরকার। কলেজের এই অভাবটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন বিদ্যাসাগর নিজেকে দিয়েই। বাংলায় ভালো অধিকার জন্মানোর জন্য সংস্কৃত পড়া, আবার নতুন যুগের উপযোগী যথার্থ জ্ঞানার্জনের জন্য ইংরেজি। কলেজে তাই ইংরেজির প্রয়োজন।

কিন্তু শুধু তো কলেজের কথা নয়। ইংরেজি শিখতে পারবে দেশের ক'জন? তাতে কী সত্যিকার জনশিক্ষা হবে? আর শিক্ষা যদি সাধারণের মধ্যে ছড়িয়েই না পড়ল, জনশিক্ষাই যদি না হল, তো লাভ হল কী? তাই, বাংলা-শিক্ষা একান্ত দরকার। মাত্র তারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

আজও পর্যন্ত আমাদের যে জনশিক্ষার দাবি — বিদ্যাসাগরের গলাতেই এই প্রথম তার ধ্বনি উঠল।

এ দাবি মেটানো যায় কী ক'রে?

বসে থেকে লাভ নেই। বন্ধুরা পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন, বাংলা এবং ইংরেজি সহজে শিখবার মত প্রাথমিক বই লিখতে হবে। প্যারীচরণ সরকার লিখবেন ইংরেজি, বিদ্যাসাগর বাংলা। লেখা হল 'বর্ণপরিচয়'।

ছোটদের জন্যে বাংলা বই আরো লিখেছেন তিনি। যেমন, 'বোধোদয়', 'কথামালা'। এই 'কথামালা' আরেকটা বই যা না পড়লে ছেলেবেলাকার তৃপ্তি আমরা অনেকটাই হারাতাম। সেই ছোট ছোট গল্পগুলি, সেই যে 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল', আর 'আঙুর ফল টক', আর 'দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ' — কে না পড়েছি সেই গল্পগুলি! আবার পড়েছি, আর পড়ে কেবলই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আমাদের অনেকের একটা বিশ্রী ধারণা আছে — বিদ্যাসাগর যে বাংলা লিখতেন তা নাকি বাংলাই নয় মোটে, এমনি সংস্কৃত-ঘেঁষা। বোঝাই যায় না।

তখন কিন্তু উলটো রকম বলা হত। একটা লেখা পড়ে এক অধ্যাপক বলেছিলেন, এ কি হয়েছে, এ যে বিদ্যাসাগরী বাংলা! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়।

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগর শিক্ষার পদ্ধতিতে কী পরিবর্তন এনেছিলেন ?

২। জনশিক্ষার প্রসারের জন্যে বিদ্যাসাগর কী কী কাজ করেছিলেন ?

৩। বিদ্যাসাগরের লেখা কয়েকটি বইয়ের নাম করো।

৪। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা কেন তাঁর উপর চটেছিলেন ?

৫। মানে জেনে নিয়ে বাক্য তৈরি করো :

আমল, রেওয়াজ, ঠাওরানো, হাড়ে হাড়ে, শ্রীবৃদ্ধি।

কাস্তে

দিনেশ দাস

দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫) : জন্ম — কলকাতা। পিতা — হৃষীকেশ। কলেজে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন ; যতদিন বেঁচে-ছিলেন ততদিনই লিখেছেন। কাজ করেছেন নানারকম, তাই কবিতাও লিখেছেন বিভিন্ন স্বাদের।

এই কবিতাটি লিখেছিলেন ১৯৩৭ সালে ; ছাপা হয়েছিল ১৯৩৮-এ। সেই থেকে শুরু ক'রে আজ অবধি এই কবিতাটি নিয়ে এত হৈ-চৈ হয়েছে যে এটিকে বাংলা সাহিত্যের 'একটি বিশেষ ঘটনা' বলা হয়, আর কবি দিনেশ দাসও 'কাস্তে-কবি' নামে পরিচিত হয়ে যান।

১৯৩৭-এ পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এক ভয়ানক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। 'কাস্তে' কবিতায় কবি বলেছেন — সেই যুদ্ধ রাজাদের যুদ্ধ, সাধারণ মানুষকে তার ফলে অকারণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। সামান্য কৃষকের কাছে তার ধান কাটার কাস্তে ছাড়া আর কিছুই থাকে না যা দিয়ে সে ভয়ঙ্কর সব গুলি-গোলার মোকাবিলা করতে পারে। তবু সেই কাস্তে নিয়েই তাকে তৈরি থাকতে হবে নিজেকে রক্ষা করার জন্য।

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু।

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে !

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির — মাটির যুগ ঊর্ধ্বে।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

অনুশীলনী

১। কবিতাটির আট লাইন মুখস্থ বলো।

২। 'এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে' বলতে কবি কী বলতে চেয়েছেন বলে তোমার মনে হয়?

৩। বাক্য তৈরি করো:

বেয়নেট, কাস্তে, ইস্পাত, চূর্ণ-বিচূর্ণ, ঠোকাঠুকি, ঊর্ধ্বে।

একটি ভুতুড়ে ঘড়ি

বিমল কর

বিমল কর (১৯১৪-   ) : শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। কর্মজীবনেও বৈচিত্র্য — ১৯৪২-এ এ.আর.পি.-তে প্রথম চাকরি, ১৯৪৩-এ মিউনিশান প্রোডাকশন ডিপোয় কাজ নিয়ে চলে যান আসানসোল এবং পরের বছর রেলওয়ের চাকরি নিয়ে কাশী। সাহিত্য-সাধনার সূত্রেও নানাভাবে সম্পাদকের কাজ করেছেন। পুরস্কারের সংখ্যাও অজস্র। আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৭); আকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৫); কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার (১৯৮১); দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নরসিংদাস পুরস্কার (১৯৮২)।

শুয়ে বসে গল্প করছি। করতে করতে নিত্যর বাবার কথা উঠল। তার বাবার মৃত্যুর থেকে কথাটা গড়িয়ে আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম, জাতিস্মর এই সব প্রসঙ্গ থেকে একেবারে ভূতের প্রসঙ্গে চলে গেল।

আমি বরাবরই একটু ভিতু গোছের লোক। ভূত মানি আর না মানি গা-ছমছমে গল্প শুনলে অস্বস্তি হয়। তার ওপর ওই নতুন জায়গা ঘরের মধ্যে তাকালে ছাদটাও ভাল চোখে পড়ে না — এত উঁচু ছাদ, আর এমনই মিটমিটে আলো। তিন-চারটে কুলুঙ্গিতে যেন অন্ধকারের তাল জমে আছে। দেওয়াল-তাক গোটা দুই, দেখতে চোরা-দরজার মতন।

বিভূতি স্কুলের সায়েন্স টিচার। ফিজিক্স আর অঙ্ক পড়ায়। নিজেকে সে কি ভাবে জানি না; তবে আমার মতন ভিতু নয়। ভূতটুত মানে না। ভূতের গল্পে তার রুচি থাকলেও ভূতে নেই। বিভূতি ইয়ার্কি-ঠাট্টা করছিল। তামাশা করছিল।

রাত হয়ে যাচ্ছে। লম্বা একটা হাই তুলে বিভূতি বলল, 'ভূতের ব্যাপারে আমার থিয়োরি হচ্ছে — যার ভূত ভবিষ্যৎ কোনোটাই নেই সেইটেই হচ্ছে আসল ভূত, আদি ভূত।'

আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম, 'প্রায় তোর মতন অবস্থা তাহলে!'

'ভূত দেখাবি?' বিভূতি তামাশা ক'রে বলল, 'তোদের এই বাড়ির চারপাশে যত নিম, বেল, কাঁঠাল গাছ, তাতে দু'চারটে ভূত থাকলেও থাকতে পারে।'

নিত্য বলল, 'না, বাইরে নেই। ভেতরেই এক জিনিস আছে, যার ভয়ে আমি মরছি। দাঁড়া; আসছি।'

নিত্য এই বলে উঠে গেল।

আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। দুপুরে এক চোট ঘুমিয়েছি। তবু। বাইরে এলে বোধ হয় বেশি ঘুম পায়। তার ওপর বাইরে শীতের হাওয়ার শব্দ, ঘরে কনকনে ঠাণ্ডা, লেপের আরাম, ঝাপসা ঘর — ঘুমের আর দোষ কোথায়! নিত্য কোন্ জিনিস এনে দেখায়, তার জন্যে কৌতূহলও হচ্ছিল।

দুটো খাট পাশাপাশি আমাদের জন্যে পাতা। নিত্যর জন্য একটা নেয়ারের খাট। মশারি রয়েছে, শোবার সময় টাঙিয়ে নেব।

শীতটা বাস্তবিকই এখানে বেশি। ঘরের মধ্যেও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। লেপ চাপা দিয়ে বসে আছি আমরা।

নিত্য ফিরে এল।

ফিরে এসে বিছানায় বসল। বলল, 'এই জিনিসটা দেখ।'

দেখার মত অদ্ভুত কিছু নয়। একটা পকেট-ঘড়ি। মান্ধাতার আমলের। বিভূতি হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা নিল। এরকম ঘড়ি আজকাল আর দোষ দেখা যায় না। ব্যবহার করে না কেউ। আগে খুব চল ছিল। চেন-বাঁধা পকেট-ঘড়ি আমিও দেখেছি, আমার বড় মামা বরাবর ব্যবহার করতেন।

ঘড়ির উপর ঢাকনা ছিল। বুড়ো আঙুল দিয়ে আওটা টিপতেই খুলে গেল!

ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখতে লাগলাম। ডায়ালটা ময়লা হয়ে এলেও রোমান হরফের দাগগুলো পড়া যায়, কাঁটা দুটোও ঠিক আছে। কোন্

কম্পানির ঘড়ি বোঝা গেল না, লেখাটা মুছে গেছে — দু'একটা অক্ষর শুধু চোখে পড়ে আবছা ভাবে।

বিভূতি বলল, 'তোর বাবার ঘড়ি ?'

নিত্য বলল, 'না, আমার ঠাকুরদা'র।'

'তা এতে দেখবার কী আছে ? পকেট-ঘড়ি। বাইরের ডালাটায় কারুকাজ রয়েছে। এই তো ?'

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিত্য কেমন ক'রে যেন হাসল, মরা হাসি। বলল, 'ঘড়িটা এখনও চলে। দেখবি ?' — বলে ঘড়িটা নিয়ে পুরো দম দিল নিত্য। দম দিয়ে বিভূতির হাতঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে দিল। দশটা পঞ্চান্ন। বলল, 'ঘড়িটা চলছে। কান দিয়ে শোন।'



কানের কাছে ঘড়ি নিয়ে শুনল বিভূতি। আমারও হাতে দিল। আমিও শুনলাম। টিকটিক শব্দ হচ্ছে। সেকেলে ঘড়ি, সেকেণ্ডের কাঁটা নেই — থাকলে কানে শুনতে হত না।

ঘড়িটা ফেরত নিয়ে নিত্য বিছানার ওপর রেখে দিল। বলল, 'ঘণ্টা খানেক আমাদের জেগে থাকতে হবে।' 'কেন ?' আমি জিজ্ঞেস

করলাম। 'ঘড়িটা এখন ঠিক চলবে। বারোটা বেজে সাত মিনিটের পর আর চলবে না।'

'তার মানে ?'

'দেখ না। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করো।'

বিভূতি বলল, 'তুই বলছিস — বারোটা বেজে সাত মিনিটে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে ?'

'কাঁটায় কাঁটায়।'

'কেন ?'

'তা জানি না।' বলে একটু থেমে আবার কি বলতে যাচ্ছিল, না বলে থেমে গেল।

বিভূতি বিশ্বাস করল না। আমিও না। যে ঘড়িটায় এইমাত্র দম দেওয়া হল সেই ঘড়ি কী করে ঘণ্টাখানেক পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ? যদি এমনই হয় ঘড়িটা খারাপ, তবে সেটা বারোটা বেজে সাত মিনিটের আগেও বন্ধ হতে পারে, পরেও পারে। ঠিক বারোটা সাতে বন্ধ হবে কেন ?

বিশ্বাস করার কারণ ছিল না। আমরা বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য কৌতূহল হল।

ঘড়িটা বিছানার ওপর রেখে আমরা বসে থাকলাম। বিভূতি এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। নিত্য বলল, এখন সে কিছুই বলবে না, আগে আমরা দেখি সে যা বলছে তা সত্যি কিনা।

বিভূতি দু'চারবার ঠাট্টা-তামাশা করল। তারপর আমরা সময় কাটাবার জন্য গল্প করতে লাগলাম। মন আর চোখ পড়ে রইল ঘড়ির কাঁটায়।

শীতের দিন। আগে বুঝিনি, ঘড়িতে রাত দেখার পর ঘুম যেন চোখের পাতায় চেপে বসছিল। ঘন ঘন হাই উঠছিল। কথা জড়িয়ে আসছিল ঘুমে।

এই ভাবে বারোটা বেজে এল।

আমরা চোখের পাতা রগড়ে সোজা হয়ে বসলাম। আর কিছুক্ষণ মাত্র। দেখা যাক, নিত্য আমাদের সঙ্গে তামাশা করল কিনা!

বিভূতি বলল, 'নিত্য, তুই যদি ধাপ্পা মেরে থাকিস, তোকে আমি বাইরে বের ক'রে দেব।'

নিত্য জবাব দিল না কথার, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল।

কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। বাইরে কোনো সাড়াশব্দ নেই, এই বাড়িটাও নিঃসাড়। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঝুম চারদিক। আমরা তিন জন মাত্র জেগে আছি। চোখের পাতা থেকে ঘুম যেন একটুর জন্য সরে গেল। দেখি, নিত্য একদৃষ্টে ঘড়ির দিকে চেয়ে আছে। তার চোখে-মুখে কেমন যেন উত্তেজনা, ভয়।

বিভূতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছিল ঘড়িটা। আমার হঠাৎ কেমন গা শিউরে উঠল। ভয়-ভয় করতে লাগল। যদি নিত্যর কথা সত্যি হয়, তবে?

বারোটা তিন হল। আমার বুক ধকধক করছিল। বারোটা চার। নিত্য একদৃষ্টে চেয়ে, চোখের পাতা পড়ছে না। বিভূতি ঝুঁকে পড়ল। বারোটা পাঁচ। ঘড়ি চলছে। মিনিটের কাঁটাটা এত আস্তে চলছে কিছুই বোঝা যায় না। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠিল। বারোটা ছয়। বিভূতি একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর নিত্যর দিকে। কোনো কথা বলল না। আমি আরও ঝুঁকে পড়লাম। বুক কাঁপছিল।

বারোটা সাত!

আমাদের তিনজনের চোখ ঘড়ির কাঁটার ওপর স্থির হয়ে আছে. নড়ছে না। তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে আছি...

সময় কাটছে তবু কাঁটা আর নড়ছে না। বিভূতি ধৈর্য হারিয়ে তার হাতঘড়ি দেখল, বারোটা নয়। তারপর পকেট-ঘড়িটা তুলে নিয়ে কানের কাছে রাখল। তার মুখ কেমন থম মেরে গেল। অবাক, বিমূঢ়, ভীত। বলল, 'বন্ধ হয়ে গেছে!'

অনুশীলনী

১। কী রকম ঘরে বসে লেখকেরা গল্প করছিলেন ?

২। 'না, বাইরে নেই। ভেতরেই এক জিনিস আছে, যার ভয়ে আমি মরছি।'
— কী জিনিস বাইরে ছিল না ? ভেতরে কী জিনিস ছিল ? ভয়ে কে মরছিল ? কেন ?

৩। 'এই জিনিসটা দেখ।'
—কে বলল ? কাকে ? জিনিসটার বর্ণনা দাও।

৪। 'বিভূতি বিশ্বাস করল না। আমিও না।'
— কী অবিশ্বাস করলেন এঁরা ? কেন ?

৫। 'চোখের পাতা থেকে ঘুম যেন একটুর জন্য সরে গেল।'
— কেন ঘুম সরে গেল ? এর পর কী ঘটল ?

৬। নিচের শব্দগুলোর থেকে বেছে সমার্থক শব্দ দিয়ে ফাঁকা জায়গা ভর্তি করো :

ঠাট্টা, জানার আগ্রহ, ঠকানো, উত্তর, রোমাঞ্চ, হতবাক্

জবাব —। কৌতূহল ——। তামাশা —।
বিমূঢ় —। ধাপ্পা দেওয়া —। উত্তেজনা —।

৭। বাক্য তৈরি করো :
বরাবর, গা-ছমছমে, মিটমিটে আলো, কনকনে ঠাণ্ডা, বাস্তবিক, মান্ধাতার আমল, ঘন ঘন, সাড়াশব্দ, একদৃষ্টে, বুক ধক ধক।

৮। ভুতুড়ে ঘড়িটা বিশেষ সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়েছে গুছিয়ে লেখো।

মিল

সামসুল হক

সামসুল হক (১৯৩৬-   ): চব্বিশ পরগণা জেলার টেকপাঁজা গ্রামে জন্ম। পিতা — আব্দুল কাদের, মাতা — সফুরা খাতুন। পেশায় শিক্ষক। কবিতা লিখে বিখ্যাত। সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লেখা বহু জনপ্রিয় কবিতা তাঁর আছে। শিশুদের জন্য গ্রন্থও রচনা করেছেন।

কতগুলি অতি-পরিচিত সামাজিক-রাজনৈতিক শব্দের সাথে অন্য শব্দ মিলিয়ে ছন্দে গাঁথা একটি অভিমত কবি প্রকাশ করেছেন এই কবিতাটিতে।

হীন খল
এর সাথে সব চেয়ে ভালো মিল
শৃঙ্খল

মুখটি
এর সাথে সব চেয়ে ভালো মিল
মুক্তি

ফুল কী
এর সাথে সব চেয়ে ভালো মিল
ফুল্‌কি

ধর তাল
এর সাথে সব চেয়ে ভালো মিল
হরতাল
হরতাল

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বলো।

২। কবি যে মিলগুলো দিয়েছেন সেগুলো তোমার কেমন লাগছে? তা কারণ দিয়ে লেখো।

৩। বাক্য তৈরি করো:

শৃঙ্খলা, মুক্তি, ফুলকি, হরতাল, হীন।

জেলেপাড়ার সঙ

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪-   ) : কর্মসূত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' গ্রন্থটি লিখে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পণ্ডিত-মহলে সুনাম লাভ করেন। এই গ্রন্থের জন্য ১৯৭৭ সালে 'প্রাণতোষ ঘটক পুরস্কার' লাভ করেন।

এই প্রবন্ধটি উক্ত গ্রন্থের একটি অংশ। কলকাতার একটি অঞ্চলের অতি জনপ্রিয় সঙের কথা এই অংশে বলা হয়েছে।



বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের সঙের মধ্যে কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার কারণ, অধিকাংশ

জায়গায় পূর্বে গান বা পালা কোন কিছু ঠিক না ক'রে সঙ নানারকম সাজে রাস্তায় বেরিয়ে এবং ইচ্ছামত আবোল-তাবোল প্রলাপ বকে কিংবা নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে দর্শককে হাসাবার চেষ্টা করত।

কিন্তু নব-প্রবর্তিত জেলেপাড়ার সঙ বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা ১৩২০ সালে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। চৈত্র মাসে সংক্রান্তির দিন জেলেপাড়ার সঙ বের হত এবং বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই তার প্রস্তুতি-পর্ব চলত। আগে থেকে পালা ও গান লেখা হত। গানে সুর দিয়ে নিয়মিত ভাবে তার মহলা চলত।

গোড়ার দিকে যাঁরা গান ও পালা রচনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী, গুরুদাস দাস, নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে রূপচাঁদ পক্ষী সেকালে গান-রচনায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর লেখা 'বাঙ্গালীর গান' বইখানিতে লিখেছেন —

'রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষী ১২২১ সালের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্বপুরুষগণের আদি-নিবাসের উড়িষ্যা-প্রদেশের চিলকা হ্রদের সন্নিকট। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশে কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেব সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রূপচাঁদের পিতামহ হরেকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র সেই গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র — গৌরহরি দাস মহাপাত্র। গৌরহরি, রাজা হরিহর ভক্তের আমমোক্তারী চাকুরি করিতেন এবং এই কারণে তাঁহাকে কলিকাতায় বাস করিতে হইয়াছিল। এই গৌরহরি দাসই রূপচাঁদের পিতা। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত আলোচনায় রূপচাঁদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। ইনি সকল প্রকার সঙ্গীত-রচনায় সুনিপুণ ছিলেন। বিশেষতঃ বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত প্রায় সমস্ত গানে পক্ষী বা খগরাজ ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। রূপচাঁদ বড়ই আমোদপ্রিয় ও রসিক পুরুষ

ছিলেন। পক্ষী-উপাধিধারী বলিয়া তাঁহার গাড়িখানি কতকটা খাঁচার আকারের মত ছিল।'

রূপচাঁদ পক্ষী জেলেপাড়ার সঙের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং দলের জন্য গান রচনা ক'রে দিতেন। জেলেপাড়ার সঙ যে-পাড়া থেকে বের হত, রূপচাঁদ পক্ষীর বাড়ি ছিল সেই পাড়ার কাছেই। নেবুতলা বাজারের সামনে দিয়ে হিদারাম ব্যানার্জী লেনের মধ্যে ঢুকে কিছু দূর গেলেই উত্তর দিকে যাওয়ার একটা গলি আছে। এই গলির বর্তমান নাম রামকানাই অধিকারী লেন। ওই গলির একটি বাড়িতে বসে করতেন রূপচাঁদ পক্ষী।

অনুশীলনী

১। বাংলায় কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কেন?

২। জেলেপাড়ার সঙ কোন্ সময় বের হত?

৩। যাঁরা গান আর পালা রচনা করতেন তাঁদের কয়েকজনের নাম লেখো।

৪। রূপচাঁদ পক্ষী সম্পর্কে দুর্গাদাস লাহিড়ী যা লিখেছেন তা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখো।

৫। বাক্য তৈরি করো:

জনপ্রিয়তা, আবোল-তাবোল, অঙ্গভঙ্গি, পরিকল্পনা, আত্মপ্রকাশ, মহলা, খ্যাতি অর্জন, পালা গান।

৬। একটি সঙের ছবি আঁকো।

যাবই যাব

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-   ) : জন্ম—কলকাতা। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক। শিশুপত্রিকা 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক। 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৭৪ সালে আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

ছোটদের জন্য লেখা বহু কবিতা ও ছড়ার মধ্যে এটি একটি। পূজার ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া প্রসঙ্গে লেখা এই ছড়াটি।



কলকাতাকে কয়েকটা মাস
    ভীষণ-রকম জ্বালিয়ে
নীল হয়েছে ওই তো আকাশ
    বর্ষা গেছে পালিয়ে।

সোনায় মাজা ঝকঝকে দিন।
চিত্ত দিচ্ছে রাঙিয়ে
গলির মোড়ে 'সার্ব্বজনীন
পূজা'র নোটিস টাঙিয়ে।

এইবারে ভাই চলো সবাই
দিঘায় কিংবা পুরীতে
ঢেউয়ের মধ্যে ঝাপ্‌টানি খাই,
কিংবা শিলিগুড়িতে
খেলনা-ট্রেনেও বেশ চড়া যায়,
দেখব সবাই তাকিয়ে
রৌদ্র কেমন পাহাড়চূড়ায়
আবির দিচ্ছে মাখিয়ে।

অনুশীলনী

১। কলকাতাকে বর্ষা কয়েকটা মাস কী ভাবে জ্বালায়? তারপর বাঙালীদের মনে কিসের ছট্‌ফটানি জাগে বলে কবি বলছেন? সংক্ষেপে লেখো।

২। কবিতা থেকে শব্দ নিয়ে নিচের ফাঁকগুলো ভর্তি করো:

—— মাজা। —— দিন। —— পূজা।

—— মধ্যে। —— খাই। —— রকম।

৩। বাক্য তৈরি করো:

ভীষণ-রকম, ঝকঝকে, রৌদ্র, পাহাড়চূড়ায়, আবির।

সদা সত্য কথা বলিবে

[নাটিকা]

মন্মথ রায়

মন্মথ রায় (১৮৯৯-): মৈমনসিংহের গালাগ্রামে জন্ম। এম. এ., বি. এল. পাস ক'রে বালুরঘাটে আইন ব্যবসা করেছেন। বর্তমানে বাস কলকাতায়। নাটক রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

এটি ছোটদের জন্য লেখা একটি ব্যঙ্গ-নাটিকা। যে-সব নীতি ছোট থেকে বইতে আমরা পড়ি, সেগুলির বাস্তব রূপায়ণে কি রকম অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে — সেই নিয়েই এই নাটিকাটি লেখা।

[কলিকাতা। ফ্ল্যাটবাড়ির একটি কক্ষ। বাড়ির ছোট ছেলে দশ বৎসর বয়স্ক পল্টু পাঠরত।]

পল্টু: 'সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা মহাপাপ।'

[মুখস্থ করিতে পুনঃ পুনঃ পাঠ। সংলগ্ন কক্ষ হইতে বড় ভাই বিশ বৎসর বয়স্ক মণ্টুর প্রবেশ।]

মণ্টু: হ্যাঁরে পল্টু, খুব তো পড়ছিস, 'সদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করা মহাপাপ'। কিন্তু একটা কথার জবাব দে দেখি।

পল্টু: কী দাদা?

মণ্টু: আমার এক বন্ধু আসবে — তাকে জল খেতে দেব বলে ও ঘরে মীট্‌সেফে চারটে রসগোল্লা লুকিয়ে তুলে রেখেছিলাম। এখন দেখছি নেই।

পল্টু: সে আমি কি জানি দাদা! (সঙ্গে সঙ্গে পাঠ —) 'সদা সত্য কথা বলিবে —'

মণ্টু: তুই জানবি না তো কে জানবে! বাড়িতে আর কে আছে?

পণ্টু ঃ কেন, তুমি আছ। ঝি এসেছিল, সঙ্গে তার বাচ্চা ছেলেটাও এসেছিল। (পুনরায় পাঠরত —) 'সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না।'

মণ্টু ঃ 'কদাচ মিথ্যা বলিবে না!' বটে! ওই চারটে রসগোল্লা তুই চুরি ক'রে খাস নি?

পণ্টু ঃ না, আমি খাই নি। (পুনরায় পাঠ —) 'না বলিয়া খাইলে চুরি করা হয়। চুরি করা মহাপাপ।'

মণ্টু ঃ তুই খাস নি বলছিস — আর তোর মুখে এখনো রস লেগে রয়েছে!

[শোনা মাত্র পণ্টু চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখে হাত দিয়া দেখিয়া লইল রস লাগিয়া রহিয়াছে কিনা।]

পণ্টু ঃ কই, না তো!

মণ্টু ঃ নেই আমি তা জানি। কিন্তু আছে বলতেই চমকে উঠে মুখে হাত দিয়ে দেখলি কেন?

পণ্টু ঃ তুমি বললে যে। তাই দেখলাম।

মণ্টু ঃ তবেই দেখ্, খেয়েছিস বলেই মনে ভয়টা ছিল। না খেলে তুই কখনো মুখে হাত দিয়ে দেখতিস নে। মনে পাপ ছিল যে! পণ্টু, তুমি ধরা পড়ে গেছ। মুখে রস লেগে আছে কিনা দেখাতেই তোমার চুরি ধরা পড়ে গেছে। এদিকে আয় বলছি।

পণ্টু ঃ (ভয় পাইয়া) আর কখনো খাব না।

মণ্টু ঃ না না, উঠে কাছে আয়। চুরি ক'রে খাওয়া তোর রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে! আজ তার ওষুধ দিচ্ছি।

পণ্টু ঃ এবারটি মাপ করো, দাদা।

মণ্টু ঃ অনেকবার মাপ করেছি। আজ আর নয়। ভাল চাস তো কাছে আয় বলছি।

[পণ্টু ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

মণ্টু ঃ ও! কাঁদলে আমি ছাড়ব না। (শাসাইয়া) আয়

বলছি! (পল্টু ভয়ে ভয়ে কাছে আসিলে) কান ধর্। (পল্টু কান ধরিল।) এইবার নাকে খত দে। ভাল চাস তো কথা শোন্ — নইলে তোর ওই পিঠ আস্ত থাকবে না। — (পল্টু ভয়ে ভয়ে নাকে খত দিল।) — এইবার বল্ — আর কখনো চুরি করিব না — (পল্টু বলিল) — আর কখনো মিথ্যা বলিব না — (পল্টু বলিল) — আর কখনো এমন সব পাপ করিব না — (পল্টু বলিল) — বেশ, এবার ওঠ্। পড়্ যা পড়ছিলি। আমি রেশনটা নিয়ে আসছি। আমার এক বন্ধু আসবে — এলে বসতে বলবি।

[মন্টু বাজারের ব্যাগটি লইয়া রেশন আনিতে চলিয়া গেল। পল্টু চোখের জল মুছিতে মুছিতে পুনরায় পূর্বোক্ত পাঠ পড়িতে লাগিল। বাহির হইতে একটি তরুণ যুবক আসিয়া দাঁড়াইল।]

যুবক : কী খোকা, পড়তে পড়তে কাঁদছ কেন?

পল্টু : দাদা রেশন আনতে গেছে। আপনাকে বসতে বলে গেছে। (পাঠ) 'সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না।'

যুবক : দাদা বাড়ি নেই, বাবা আছেন তো?

পল্টু : না, বাবা তো এখানে নেই!

যুবক : বাবা নেই, মা আছেন তো?

পল্টু : না, মাও নেই। বাবা আর মা ভারতদর্শন-ট্রেনে তীর্থ করতে গেছেন — বিল্টুও সঙ্গে গেছে।

যুবক : তুমি গেলে না যে?

পল্টু : না না, আমার যে একজামিন!

যুবক : তা তুমি একা রয়েছ?

পল্টু : না না, দাদা তো আছে। দাদার নতুন চাকরি কিনা, ছুটি পায় নি।

যুবক : আ-হা-হা। ভারতদর্শন-ট্রেনে কত সব ভালো ভালো আর বড় বড় তীর্থ দেখা যায়। আঃ, তোমাদের যাওয়া হল না! কদ্দিন হল ওঁরা গেছেন?

পল্টু ঃ এক মাস হয়ে গেছে।

যুবক ঃ তোমাদের বাড়িতে মোট কজন লোক, খোকা ?

পল্টু ঃ কেন, দুজন, আমি আর দাদা।

যুবক ঃ সে তো এখন। যখন বাবা, মা আর বিল্টু থাকে তখন সব মিলে কজন ?

পল্টু ঃ বা রে ! ওঁরা যখন থাকেন, তখন পাঁচজন।

যুবক ঃ ওই পাঁচজন ছাড়া তোমাদের বাড়িতে আর কেউ থাকে না বুঝি ?

পল্টু ঃ না তো !

যুবক ঃ তোমাদের ঘর কটা ?

পল্টু ঃ এই তো, এটা আর ওটা — দুটো।

যুবক ঃ আচ্ছা, দুটো ঘরে মাত্র পাঁচজন লোক। আমি ভাবছিলাম জন দশেক থাকো।

পল্টু ঃ পাঁচজনেরই জায়গা হয় না, দশ জন কি ক'রে থাকবে !

[রেশন লইয়া মণ্টুর প্রবেশ]

যুবক ঃ এই যে, রেশন নিয়ে এলেন বুঝি ?

মণ্টু ঃ আপনি কে ?

যুবক ঃ কেন, রেশনের দোকানের আশেপাশে আমাকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেন নি কোনদিন ?

মণ্টু ঃ কী জানি, কী চাই বলুন তো ?

যুবক ঃ ক'জনের রেশন আনলেন ?

মণ্টু ঃ তা দিয়ে আপনার দরকার কী ?

যুবক ঃ আমি পুলিস। এই দেখুন আইডেনটিটি-কার্ড। আপনার রেশন কার্ডটা দেখি, (মণ্টু ইতস্ততঃ করিলে তীব্রকণ্ঠে) ভাল চান তো দিন বলছি। (মণ্টু রেশন কার্ডটি দিল।) ও বাবা ! রেশন কার্ডে দেখছি দশজন। (পল্টুকে) এই, তুমি পড়ছো না কেন ? তুমি তোমার পড়া পড়।



পল্টু : (ভয় পাইয়া জোর গলায় পড়িতে লাগিল) 'সদা সত্য কথা বলিবে। চুরি করা মহাপাপ।'

যুবক : তা এই রেশন কার্ডের দশজন লোক— সব এখানে আছেন?

মণ্টু : আছেন বইকি! আজকে সকালে হাওড়ায় গেছেন মাসিমার বাড়ি। বিকেলে ফিরবেন। (পল্টু ফ্যালফ্যাল করিয়া দাদার দিকে তাকাইল) আঃ! তুই পড় না --

পল্টু : (জোর গলায়) 'সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা বলিবে না।'

যুবক : কিন্তু আপনার এই সত্যবাদী ভাই বলছে —

মণ্টু : কী বলছে ? (পল্টুকে) কী বলেছিস তুই ?

পল্টু : আমি সত্য কথাই বলেছি দাদা। নাকে খত দিয়েছি যে! বলেছি বাবা, মা আর বিল্টু এক মাস হল দেশ দেখতে বেরিয়েছেন। বাড়িতে রয়েছি শুধু তুমি আর আমি।

যুবক : তোমাদের বাড়িতে মোট কজন লোক, খোকা ?

পল্টু ঃ বললাম তো, পাঁচজন। একটু আগে নাকে খত দিয়ে বলেছি মিথ্যে কথা কখনও বলব না।

যুবক ঃ তুমি খোকা, সত্যি কথাই বলেছ। কিন্তু তোমার দাদা মিথ্যে কথা বলছেন। (মণ্টুকে) এবার চলুন থানায়।

মণ্টু ঃ এবারটির মত দয়া ক'রে ছেড়ে দিন, স্যার।

যুবক ঃ দেখুন, এই ভুয়ো রেশন কার্ড রাখা যে কতদূর সামাজিক অপরাধ তা বোঝার বয়স আপনার কী এখনো হয় নি ? এ তো দস্তুরমত চুরি !

পল্টু ঃ (জোর গলায় পাঠ) 'চুরি করা মহাপাপ।'

যুবক ঃ শুনলেন তো! সত্যিই মহাপাপ! পাঁচজন ভুয়ো লোক দেখিয়ে রেশন নিচ্ছেন দশজনের। এতে পাঁচজন লোককে বঞ্চিত ক'রে তাদের ভাত মারছেন আপনি। নিশ্চয়ই এই বাড়তি রেশন চোরা বাজারে বিক্রি করেন। এর চেয়ে বড় সামাজিক অপরাধ আজ আর নেই। চলুন থানায়।

মণ্টু ঃ আমি নাকে খত দিচ্ছি স্যার, এবারটি ছেড়ে দিন।

যুবক ঃ সে আমি কিছু বলতে পারছি না। আসুন থানায়। তারপর যা হয় দেখা যাবে। (পল্টুকে) খোকা, তুমি যেমন পড়ছিলে, পড়। জামিনে খালাস হয়ে দাদা এখনই ফিরে আসছেন। (মণ্টুকে) আসুন। কাছেই তো থানা। রেশন-ব্যাগটি হাতে নিন। (মণ্টু ইতস্ততঃ করিলে ধমক দিয়া) নিন বলছি।

[রেশন ব্যাগ লইয়া মণ্টু যুবকের সাথে চলিল।]

মণ্টু ঃ (পল্টুকে) তুই পড়তে থাক্। আমার এক বন্ধু আসবে আমার ফিরতে দেরি দেখলে তাকে থানায় পাঠিয়ে দিস। চলুন —

[যুবকের সহিত মণ্টু চলিয়া গেল। কাঁদো কাঁদো স্বরে
পল্টু পড়িতে লাগিল।]

পল্টু ঃ 'সদা সত্য কথা বলিবে।' বলিলে ধরা পড়িতে হয়।

[ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।]

অনুশীলনী

১। মণ্টু রসগোল্লার রহস্য ভেদ করল কী ভাবে ?

২। যুবক এসে মণ্টুকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করল কী ভাবে ? ছ' লাইনে বুঝিয়ে লেখো।

৩। 'সদা সত্য কথা বলিবে। বলিলে ধরা পড়িতে হয়' বলে পণ্টু ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলল কেন ?

৪। নাটকটি কার লেখা ? তাঁর সম্বন্ধে দু-এক কথা লেখো।

৫। নাটকের চরিত্রগুলি, অর্থাৎ পণ্টু, মণ্টু, যুবক — এরা কে কেমন ?

৬। ফাঁক ভরাও :

ভারতদর্শন —। এটা —। ভ্যাঁ —।

মোট লোক —। সদা সত্য — বলিবে।

নয়া চর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-): চব্বিশ পরগণার বহড়ুতে জন্ম। সাহিত্য-আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় কবি। উপন্যাসও লেখেন মাঝে মধ্যে। ছোটদের জন্যও সমানেই লেখেন। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

এই কবিতার তাতার একটি ছোট্ট ছেলে। হলদিয়ায় বেড়াতে গিয়ে সে কিরকম ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে—তাই নিয়ে লেখা এই কবিতাটি। অবশ্য হলদিয়ার আসল চেহারার সাথে কবির কল্পনা মিশেছে।

হলদি নদীর বুকের মধ্যে নয়াচরের মাঝে
বাংলো থেকে শুনতে পেলুম কাঁসর-ঘণ্টা বাজে!
কে বাজাল কাঁসর-ঘণ্টা? কে বাজাতে পারে?
বায়নাকুলর দিয়ে দেখলুম তাতার চরের ধারে।

কখন অন্যমনস্কতায় তাতার হল পার,
সন্দেহভঞ্জন করাতে ঢুঁড়ি ঘরদুয়ার।
ঘরের মধ্যে কী ক'রে পাই বাইরে যখন আছে?
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে, পড়ে রবার গাছে।

সদ্যজাতক চরের মধ্যে কেবল চরের ঘাস,
তার উপরে বৃষ্টিমুখর হলদিয়ার আকাশ।
এপার থেকে ডাকি 'তাতার', হলদি হজম করে,
চরের দখল নিল তাতার সাগর-ছেঁচা ঝড়ে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।

২। 'তাতার' কে ? সে চরের দখল নিল কেমন ক'রে ?

৩। সেকালের তাতারদের কথা জেনে নিয়ে লেখো।

৪। বাক্য তৈরি করো :

নয়াচর, কাঁসর-ঘণ্টা, সন্দেহভঞ্জন, ঘরদুয়ার, সদ্যজাতক।

৫। হলদিয়ার আকাশের নিচে যে নয়াচরের কল্পনা কবি করেছেন, তা নিজের মত ক'রে সংক্ষেপে লেখো।

৬। নিচের শব্দগুলির পদ ও তার শ্রেণীবিভাগ লেখো :

বাংলো, বায়নাকুলর, অন্যমনস্কতা, নদী, হজম।

আশীবিষের আত্মকথা

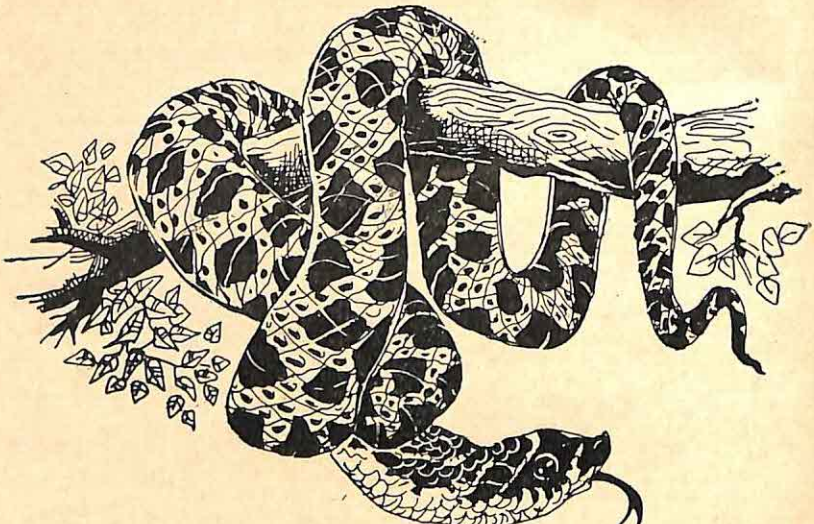
অসীম বর্ধন

অসীম বর্ধন (১৯৩০-) : জন্ম — কলকাতা। পিতা — অনিলকুমার, শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাবিজ্ঞানে পি-এইচ.ডি। ইনিও শিক্ষকতা করেছেন, বর্তমানে গ্রন্থ সম্পাদনা ক্ষেত্রে নিযুক্ত। ছোটদের জন্য পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন।

এই প্রবন্ধটি সাপ সম্পর্কে লেখা। সহজ ভাষায় প্রাণীবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন লেখক।

আমাদের কারো পা নেই। 'সাপের কটি পা ?' — এই যে ধাঁধা আছে, ওটা কেবলই লোক-ঠকানো।

আমাদের মেরুদণ্ড থেকে অনেকগুলো পাঁজরা বেরিয়েছে ঠিক মানুষদের মতোই — গোল। তবে আমাদের পাঁজরাগুলো সর্বাঙ্গে ছড়ানো আর এমন ভাবে মেরুদণ্ডের সাথে লাগানো, যাতে যেদিকে



যেমন খুশি বেঁকানো যায়। এই পাঁজরাগুলির শেষ দুটি ক'রে প্রান্ত যেগুলি মাটির দিকে থাকে, সেগুলির সাহায্যেই আমরা আমাদের চামড়াকে কুঁচকে নিয়ে এগিয়ে চলি।

আমরা কখনো চোখ বন্ধ করি না, কেন না আমাদের চোখের পাতাই নেই। শুধু আছে চোখের ওপর কাঁচের মতো স্বচ্ছ অথচ মজবুত একটা আবরণ। এই পলকবিহীন দৃষ্টির জন্যে আমাদের চোখ এড়িয়ে পালানো বড় শক্ত ব্যাপার।

কক্ষনো আমরা মানুষ খাই না। আমরা ছোটখাটো জীবজন্তু পেলেই খুশি থাকি। মাছ, ইঁদুর, ব্যাং, টিকটিকি, পাখি, খরগোশ — এইসব। যারা লোভে পড়ে বড় জন্তু জানোয়ার গিলে খেতে যায়, তাদের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে পড়ে। অনেকে মরেও যায়।

আমরা সব জিনিসই গিলে খাই। গলা দিয়ে একটু ভেতরে গেলেই খাবারের ওপর এমন একটা চাপ দিই যে, ভেঙে চেপটে পিণ্ডি পাকিয়ে যায়। তারপর পেটে চালিয়ে দিই।

শীত আমরা মোটেই সহ্য করতে পারি না। শীতে আমরা টেনে ঘুম দিই। তাই মেরুপ্রদেশ ছাড়া জগতের সব জায়গাতেই জলে স্থলে আমাদের বিচরণ আছে। অন্ধকার নিরিবিলি জায়গাই আমাদের পছন্দ।

কবিরা আমাদের বলেন 'আশীবিষ'। তাই বলে আমাদের সকলেই বিষধর নয়। আমাদের বিষে মানুষ যেমন মরে, আবার তেমনি ঐ বিষ দিয়েই তৈরি হয় জীবনদায়ী ওষুধ।

অনুশীলনী

১। কথায় বলে 'সাপের পাঁচ পা দেখেছ?' — কথাটায় ধাঁধা লাগে কেন বল তো?

২। একটি সাপের মেরুদণ্ড আর পাঁজরের অবস্থিতি বর্ণনা করো।

৩। ‘আমরা কখনো চোখ বন্ধ করি না।’

— কারা করে না ? কেন ?

৪। কবিরা ‘আশীবিষ’ বললেও আসলে সাপেরা কী সবাই ‘আশীবিষ’ ?

৫। সাপের বিষ দিয়ে মানুষ কী বানায় ?

৬। বিবরণ দাও :

(ক) ‘চামড়াকে কুঁচকে নিয়ে এগিয়ে চলি।’

(খ) ‘আমরা সব জিনিসই গিলে খাই।’

(গ) ‘শীত আমরা মোটেই সহ্য করতে পারি না।’

(ঘ) ‘জলে স্থলে আমাদের বিচরণ আছে।’

(ঙ) ‘ঐ বিষ দিয়েই তৈরি হয় জীবনদায়ী ওষুধ।’

৭। বাক্য তৈরি করো :

মেরুদণ্ড, স্বচ্ছ, মজবুত, আবরণ, পিণ্ডি।

৮। মোটা হরফের শব্দগুলির কারক ও বিভক্তি বলো :

(ক) **আমাদের মেরুদণ্ড** থেকে অনেকগুলো **পাঁজরা** বেরিয়েছে।

(খ) কক্ষনো **আমরা মানুষ** খাই না।

(গ) ঐ **বিষ** দিয়েই হয় জীবনদায়ী **ওষুধ**।

রূপসী বাংলা

সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামাল (১৯১১-): বেগম সুফিয়া কামালের জন্ম কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। কবি ও সমাজসেবিকা হিসাবে তিনি সুপরিচিতা। তাঁর কাব্যগ্রন্থ — 'সাঁজের মায়াকাজল', 'মন ও জীবন' এবং গ্রন্থ গল্প — 'কেয়ার কাঁটা'।

এই কবিতাটি শীতের প্রারম্ভে বাংলাদেশের রূপ বর্ণনা ক'রে লেখা।

এই তো হেমন্ত দিন, দিল নব ফসল সম্ভার
অঙ্গনে অঙ্গনে ভরি — এই রূপ আমার বাংলার।
রিক্তের অঞ্চল ভরি, হাসি ভরি ক্ষুধার্তের মুখে
ভবিষ্য সুখের আশা ভরি' দিল কৃষকের বুকে।
শিশির সিঞ্চনে সিক্ত ধরা বুকে তৃণাঞ্চল জাগে,
সোনালী ধানের ক্ষেতে ঈষৎ শীতার্ত হাওয়া লাগে।
আনন্দ-অশ্রুতে যেন ভিজা ভিজা আঁখির পল্লবে
মাটি মাতা হেরিতেছে নবান্নের আসন্ন উৎসবে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ করো।

২। কবি বাংলার গ্রামের যে রূপ তুলে ধরেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

৩। মানে বলো:

সম্ভার, অঙ্গনে, রিক্ত, ক্ষুধার্ত, ভবিষ্য, কৃষক, সিঞ্চন, তৃণাঞ্চল।

৪। বাক্য তৈরি করো:

হেমন্ত, ফসল, সুখ, আশা, সোনালী, আনন্দ-অশ্রু।

পূর্ণ মূষিক

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২২-): জন্ম — কলকাতা। পিতা — দুর্গানন্দ, মাতা — উমা দেবী। সাংবাদিকতা দিয়ে লেখা শুরু। শিশু-সাহিত্য, উপন্যাস, ছোট গল্প ও পাঠ্যপুস্তক — সবই লেখেন। শিক্ষকতা ও সমাজসেবায় নিযুক্তা।

এটি একটি আধুনিক রূপকথা। রঙ-চঙ, হাসি-খুশিতে ভরপুর।

বেজায় গরম। সুন্দরবনের গাছপালাগুলো পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, একটা নেংটি ইঁদুর, নাম পুটু, ঘেমে-নেয়ে চান হয়ে বলে উঠল, 'সিংহমশাই তো আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে গুজরাটের গির জঙ্গলে চলে গেলেন, বলেও গেলেন যে আর ফিরবেন না। সুন্দরবনটা একেবারে রাজাহীন হয়ে গেল গা!'

তখনও সূর্য ডোবে নি। গাছের কোটর থেকে হুতোম প্যাঁচা তাই চোখ পিট্‌পিট্ ক'রে বলে উঠল, 'আমি রাতের রাজা! সারা রাত বন পাহারা দিই — জীবজন্তুদের দেখ্-ভাল করি। আমার মত দূরদৃষ্টি এ বনে কারুর নেই হে চাঁদ —!'

শুনে পুটুরাম কুটুর-পুটুর ক'রে বলে উঠল, 'আমি তো জানি ঈগল পাখির দৃষ্টি মগের মুল্লুক পর্যন্ত চলে যায়।'

কথা শেষ হবার আগেই ঝুপ ক'রে সূর্য ডুবে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে হুতোম ডানা ঝাপ্‌টে চলে এল ইঁদুরের গর্তের সামনে। — 'তবে রে হতভাগা পুটু!' — বলে যেই না সে পাখা ঝাপ্‌টে ইঁদুরের গর্তের দিকে গেছে, পুটু বেচারী পড়ি-মরি ক'রে ভুলে সাপের গর্তে ঢুকে পড়েছে। সাপ তো অবাক। না চাইতেই খাবার মুখে এসে হাজির!

পুটু ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, 'চুপ, চুপ! একদম নোড়ো না। ওপরে হুতোম প্যাঁচা সাপ খুঁজতে বেরিয়েছে।

তাই ছুটে তোমায় জানাতে এলাম। হুতোমের না, আজকাল বড্ড বাড় বেড়েছে। নিজেকে বনের রাজা বলছে। ঈগলের চাইতে নাকি ওর দৃষ্টির দর বেশি!'

কথা শুনে সাপ রেগে ফোঁস ফোঁস ক'রে উঠে, ল্যাজ আছড়ে বলল, 'ও! ঐ গোলচোখো আহাম্মকটা আজকাল এইসব বলছে? ফের যদি তুই ওর নাম আমার সামনে করিস তো তোকে আস্ত গিলে খাব কিন্তু পুটু — মনে থাকে যেন।'

পুটু বেচারী এতই ছোটখাটো (তিন কি সাড়ে তিন সেন্টিমিটার হবে) যে, যেখানেই যায়, সেখানেই কথায় কথায় তাকে গিলে ফেলার কথা ওঠে।

গর্ত থেকে সুট্ ক'রে বেরিয়ে পড়ে পুটু চারধারটা নজর ক'রে দেখে নিল। তারপর পকেট থেকে পুঁচকে রুমালটা বার ক'রে ঘাম মুছে নিয়ে আপন মনে বলল, 'কিছু না হোক্, বাঘমশাই বলেছেন, অভিনয়টা আমার আসে।'

পথে, খানিকটা এগিয়ে ভাল্লুকদাদার সঙ্গে দেখা। পুটুকে এরকম অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে দেখে থমকে পড়ে বলল, 'আরে, এই ভরসন্ধেবেলা, এভাবে, পুটুরাম — তুমি কোথায় চলেছ বাছা?'

হেঁড়ে গলায় এমন মিষ্টি কথা শুনে পুটু আহ্লাদে গদগদ হয়ে উঠে বলল, 'আর বলো কেন দাদা! বলে, পড়েছি যবনের হাতে — খানা খেতে হবে সাথে। বাঘমশাই বুড়ো হয়েছেন। যাত্রা দেখতে খুব ভালোবাসেন। বললেন, "পুটু, যাত্রার হাওয়া আবার উঠেছে। বড় সাধ হয় চন্দ্রগুপ্ত পালায় সম্রাটের রোলটা করি। শেষ বয়সের সাধ — মিটিয়ে দে পুটু!" — হা ভগবান, সে সুন্দরবনও নেই, সে রয়েল বেঙ্গল টাইগারও নেই। বাঘরাজামশাইয়ের কথা কটা শুনে আমি শেষে যাত্রা পার্টি খুলে বসলাম।'

পুটুর কথা শুনে ভাল্লুক তো হাসতে হাসতে বিষম খেয়ে মরে আর কি! খানিক পরে সামলে-সুমলে নিয়ে বলল, 'পুটু রে। সুন্দরবনের



শেষে এই হল? রয়েল বেঙ্গল টাইগার — রাজার জাত। সে হবে নকল সম্রাট! উঃ!'

পুটু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ভাল্লুককে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'কি যে বলো দাদাভাই! সে সব দিন কী আছে? সম্প্রতি বাঘমশাই ভয়ানক ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠলেন। কুইনিন খেয়ে খেয়ে কানেও শোনেন না, চোখেও ঝাপসা দেখেন, স্মরণশক্তিটাও গেছে! তাই মনটা ভুলিয়ে রাখার জন্য চন্দ্রগুপ্তের ডায়ালগ শেখাচ্ছি। বলা যায় না, শেষে যদি মানুষ-খেকো হয়ে পড়েন!'

ভাল্লুক তো তাজ্জব! 'মানুষখেকো হবেন! মানুষই বা কোথায়? দু-চারটে রোগা-পটকা কাঠুরে কিংবা এই হতভাগা জানোয়ার-চোরগুলো...'

পুটু তাড়াতাড়ি বলল, 'দাঁড়াও না, আসবে। বন কেটে কেটে আসছে যে সব! সারা সুন্দরবন জুড়ে যাত্রাপার্টি বসবে। ওঃ!'

ভাল্লুক গজগজ ক'রে বলে উঠল, 'এখানে অত মানুষের যাত্রাপার্টি

বসালে আমিও কিন্তু মানুষখেকো হবো, এই বলে দিলাম — হ্যাঁ!'

পুটু হৈ-হৈ ক'রে উঠল, 'ও কাজটি কোরো না। তুমি নিরামিষাশী মানুষ, মানুষখেকো হতে যাবে কি দুঃখে! তুমি রাগ কোরো না ভাল্লুকদাদা, আমার কথাটা শেষ হয় নি, তাই আবার বলছি, আমার যা নাম হয়েছে না, ভাবা যায় না। আমি শিগ্‌গির ফিল্মে নামব। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হব। তোমাকেও আমি একটা পার্ট দিতে পারি দাদা। কিন্তু কক্ষনো যেন উচ্ছ্বাস ক'রে আমায় জড়িয়ে ধোরো না। তোমরা তো এ ব্যাপারে রাজা! ধরেছ কি মরেছি!'

হুশ ক'রে ডানা ঝাপটে এল ঈগল। 'কি গো পুটুবাবু, অভিনেতা হবার স্বপ্ন দেখতে যেন বড্ড মশগুল হয়েছ! বকে বকে তো রাত কাবার করে এনেছ, খাবে কী? কাজকর্ম না করলে বনের নিয়মমতো তুমি কিন্তু অন্য কারুর পেটে যাবে। দুঃখ আছে কপালে।'

ঈগলের কথা শুনে ভাল্লুকও চমকে লাফিয়ে উঠল। 'ভালো কথা মনে পড়ল, কাজ পড়ে আছে। পুটুর আড্ডায় ফাঁসলে আর ভাগ্যি থাকে না! চলি!'

ভাল্লুক হুড়মুড় ক'রে কাজ সারতে চলে গেল। পুটু গোঁফ নাচিয়ে নাচিয়ে, না থেমে, বলে চলল, 'জানো ঈগল, সুখের বিষয়, আমার নাম এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, লোকে আমায় ডেকে ডেকে খাওয়াচ্ছে। বাঘমশাই তো থেকেও নেই, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। উনি স্টেজে বসে থাকেন সাক্ষীগোপালের মতো। আমরা ম্যানেজ করি। জানো ঈগলভাই, এমন কি ঐ প্যাঁচা, আমাদের ঐ হুতোমথুমো আর কি, ও পর্যন্ত আমায় নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়েছে। বলে, "মতের অমিল থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পী ইজ্‌ শিল্পী"!'

এই পর্যন্ত যেই না বলা, ওপর থেকে হুতোম প্যাঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ রবে নেমে এসে ছোঁ মেরে পুটুরামকে ল্যাজ ধরে তুলে, গাছের ডালে নিয়ে ঠোক্কর মেরে বলল, 'শিল্পী? নেংটি ইঁদুর শিল্পী হয়েছিস্! তোকে আমি খাইয়েছি মিথ্যুক? কিন্তু আমি তোকে খাব! আজই, এক্ষুনি!'

হুতোমের এই ছোট মুখে বড় কথা শুনে ঈগলের ভয়ানক রাগ ধরে গেল। ডানা মেলে সে আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে গেল। তারপর তীর বেগে নিচের দিকে নামতে থাকল। শোঁ-শোঁ ক'রে আওয়াজ শুনে হুতোম ওপর দিকে তাকাবার আগেই ঈগল এমন ঠোক্কর মারল যে, সঙ্গে সঙ্গে পুটু হুতোমের ঠোঁট থেকে ছিটকে পড়ল নিচে — একেবারে গাছতলায়। এক সেন্টিমিটার ল্যাজ রয়ে গেল হুতোমের মুখে। এখন থেকে স্টেজে বেচারীকে যে ফল্‌স ল্যাজ লাগাতে হবে, তা ভেবে পুটু বেশ খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল।

ততক্ষণে ঈগল আবার ওপর দিকে উঠতে উঠতে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আকাশের মাঝখান থেকে আমি দেখতে পাই। আমার প্রধান গুণ হল দূরদৃষ্টি। বেশি বাজে না বকে, একটু কাজ কর পুটু। গোটা সুন্দরবনই তা না হলে মানুষখেকো হয়ে উঠবে!'

ফল্‌স ল্যাজ লাগিয়েও পূর্ণ মূষিক হতে পারবে না ভেবে পুটু ছোট্ট আধ সেন্টিমিটারের মতো সাইজের মাথাটা তুলে, ওপর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'সে আর বলতে!'

অনুশীলনী

১। পুটু কে? ভুলে সাপের গর্তে ঢুকে পড়ে কী ভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে সে বাঁচল?

২। 'ও! ঐ গোলচোখো আহাম্মকটা আজকাল এই সব বলতে শুরু করেছে নাকি?'

— কে বলেছিল? 'গোলচোখো' কে? কী বলতে শুরু করেছে?

৩। 'কিন্তু কক্ষনো যেন উচ্ছ্বাস ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধোরো না।'

— কে কাকে বলেছিল? কেন?

৪। 'বকে বকে তো রাত কাবার ক'রে এনেছ, খাবে কী?'

— কে কাকে বলেছিল? আর কী সে বলেছিল?

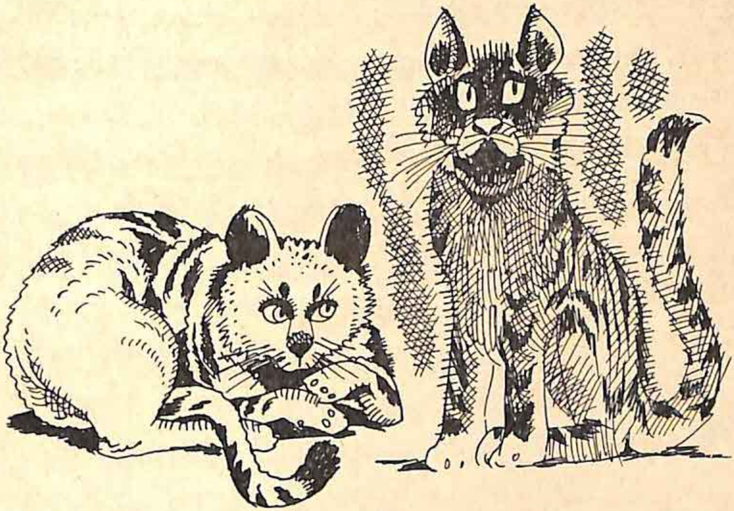
মুন্নির বেড়াল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-): ফরিদপুরে জন্ম। সাহিত্য ও সাংবাদিতাকেই জীবন ও জীবিকারূপে বেছে নিয়েছেন। কবিতা লিখে প্রথমে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও, ঔপন্যাসিক হিসাবেই বর্তমানে খ্যাতিমান। বহু পুরস্কারও লাভ করেছেন উপন্যাসের জন্য। ছোটদের জন্যও নিয়মিত লেখেন।

বেড়াল-তপস্বীর আসল আর নকল রূপ নিয়ে লেখা একটি চমৎকার মজার কবিতা এটি।

সত্যি কথা বলছি তোকে মুন্নি
তোর বেড়ালটা আসলে শাঁকচুন্নি।
দিনের বেলা এদিক ওদিক যায় না
ভাজা মাছটা উল্টে খেতেও চায় না।
সবাই বলে, আহা কেমন লক্ষ্মী!
কোথায় থাকে জানেও না কাকপক্ষী।



দুপুর বেলা গড়ায় আমার বালিশে
মুচকি হাসে আমার শত নালিশে।
বিকেলবেলা রোদ্দুরে গা শুকোয়
ইঁদুর দেখলে ঘরের কোণে লুকোয়।
সত্যি কথা বলছি তোকে মুন্নি
তোর বেড়ালটা আসলে শাঁকচুন্নি!
সন্ধে হলেই চেহারাখানি অন্য
রোঁয়া-ফোলানো 'যেন বিষম বন্য'
গোমড়া মুখ, চক্ষু দুটি অগ্নি,
বাঘের মাসী বা সিংহের ভগ্নী।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির প্রথম দশ লাইন মুখস্থ বলো।

২। নিচের শব্দগুলো থেকে বেছে নিয়ে মিল দাও:

পালিশ, জন্য, রক্ষী, শূন্যি, আয়না, লগ্নী

যায় না —। অন্য —। বালিশ —।
লক্ষ্মী —। মুন্নি —। অগ্নি —।

৩। নিচের শব্দ-জোড়াগুলো, শুনতে এক, কিন্তু মানে আলাদা। এগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি ক'রে মানের তফাৎ বুঝিয়ে দাও:

বেলা / বেলা, কোণে / কনে, থাক / থাক,
জান / যান, অন্য / অন্ন, মুখ / মূক।

গারো পাহাড়ের স্মৃতি

ভূপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ

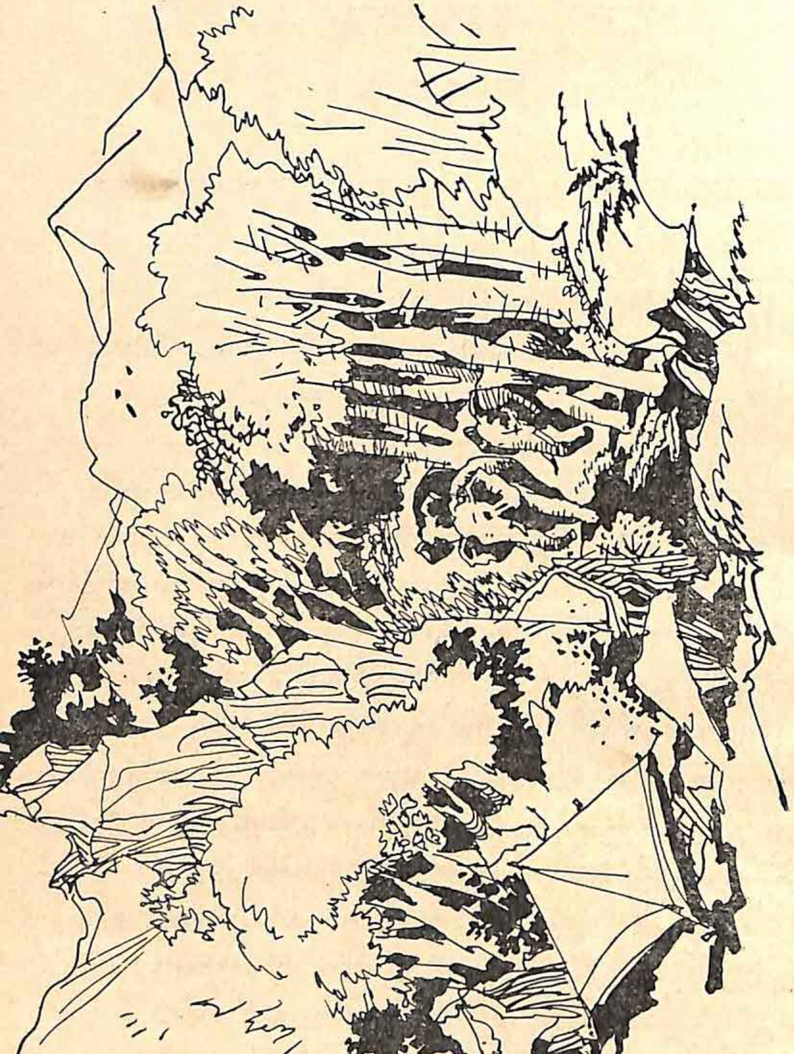
ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (১৮৯৮-   ) : মৈমনসিংহের সুসঙ্গের রাজবংশের সন্তান। পিতা—মহারাজ কুমুদবন্ধু সিংহ, মাতা—মহারাণী চিত্রাণী দেবী। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. এবং ল. পাস করেন লেখক। শিকার করতেন এবং বেশ কিছু শিকার কাহিনীর রচয়িতা।

এই অংশে গারো পাহাড়ে শিকার করতে গিয়ে হাতি দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে।

সে আজ অনেক বছর আগের কথা। কয়েক দিন হল পাহাড়ে আছি, ফাল্গুন মাস। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে গিয়েছে, চিরশ্যামল গারো পাহাড়ের রূপও তখন রুক্ষ হয়ে উঠেছে। তদুপরি পাহাড়ীরা কৃষির উদ্দেশ্যে জঙ্গল কেটে বনের চারদিকের দৃশ্যপট এমন নিষ্করুণ, শুষ্ক ও শ্রীহীন ক'রে তুলেছে যে বসন্তের বর্ণ সম্ভারের আভাসমাত্র নেই।

আমাদের তাঁবুটা ছিল ঠিক সোমেশ্বরী নদীর ধারে, উব্রেক ও সোমেশ্বরীর সঙ্গমস্থলেই বলা চলে। উব্রেক ছড়া পাহাড় থেকে বনানীর ভিতর দিয়ে এসে পূর্ব-দিকে সোমেশ্বরীতে মিশেছে, ছড়ার দু'দিকেই পাহাড়। দক্ষিণে পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ সোজা চলে গিয়েছে, এই পথের নিচেই নদীর ধারে কয়েকটি বাঁশের ঝাড়, ঠিক তার ছায়াতলেই আমাদের তাঁবু ফেলা হল, সুতরাং তাঁবুর পিছনে ছড়া এবং সম্মুখে নদী। উব্রেক ছড়ার দুই পাশে নল, ইকঁড় প্রভৃতির ঘন ঘন বন থাকায় এটি ছিল সকল রকম বন্য-জন্তুর স্বাভাবিক বিচরণ ভূমি, — বিশেষ ক'রে বৎসরের এই খরার সময়টায় এখানে নানা রকম বন্য জন্তুর যথেষ্ট ভিড় জমত।

নদীর অপর পারে আলকৃফাং বস্তী। এপার থেকে ওপারে পাহাড়ের গায়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে গারোদের মাচাং। পাহাড়ের নিচে অনেকটা



গারো পাহাড়ের স্মৃতি

বিস্তৃত সমতলভূমি — সেখানে বিদ্যালয় ও গির্জা-ঘর, এমন কি ছাত্রদের ফুটবল খেলার মাঠও আছে। গ্রামের সামনে অনেকটা বালিময় তটভূমি আর দুই পাহাড়ের মাঝখানে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী। গারোদের নিত্য জীবনযাপনের আভাস দূর থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। নদীটি গ্রাম ঘেঁষে প্রায় বৃত্তাকারে ঘুরে গিয়েছে। আমাদের কিছু দক্ষিণেই বাঘমারা রিজার্ভের আরম্ভ এবং উজানে আগ্রামের বিখ্যাত ডোবা; ডোবার পাশে খাড়া পাহাড়, জলে তার প্রতিবিম্ব জায়গাটির গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করেছে।

সেদিন 'ফাগুয়া'-র আগের দিন — সকালে কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন। আমরা প্রাতঃকৃত্য শেষ করে চা পান করছি, এমন সময় ২।৩ বার হস্তী শাবকের অতি স্পষ্ট ডাক শোনা গেল। শোনা মাত্র জংলী হাতি দেখার জন্য সকলেই উৎসুক হয়ে উঠল। বনে জঙ্গলে স্বচ্ছন্দবিহারী হাতি দেখবার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা এই বিশাল শোভন জন্তুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার দৃশ্য পুনঃ পুনঃ দেখবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারবেন না। বনে জঙ্গলে চিরদিনের সহচর, একান্ত নির্ভরযোগ্য, অদ্ভুতকর্মা জুঙ্গাকে জিজ্ঞেস করলাম — সে বলল ইচ্ছা করলে অতি অনায়াসে হাতির দল নিরাপদে দেখা যাবে। কুয়াসা কেটে গেলে রৌদ্রে পরিষ্কার খোলা জায়গায় বিচরণ করবার সময় হাতিগুলিকে সহজেই দেখতে পাওয়া যাবে। দুর্গা ও জুঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে কাল বিলম্ব না ক'রে আমরা তাঁবুর পাশের রাস্তা দিয়ে পাহাড়ে গিয়ে উঠলাম। তখনও উব্রেক ছড়ার উপত্যকার কুয়াসা দূর হয় নি; কিন্তু অপর দিকে পাহাড়ের কুয়াসা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। গাছগুলি সবে মাত্র শীতের তন্দ্রা-জড়িমা কাটিয়ে উঠে চোখ মেলে আড়ামোড়া ভেঙে যেন জেগে উঠছে। এখানেও পাহাড়ের অধিকাংশ বনই গারোরা কেটে ফেলে 'হাদাং' (অর্থাৎ ক্ষেত) করার জন্য পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে।

হঠাৎ 'ন'-বাবু, 'দেখুন দেখুন হাতি দেখা যাচ্ছে' বলে সোৎসাহে অপর দিকের পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। আমি

অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও কয়েকটা ধূসর প্রস্তরস্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু প্রায় ৩।৪ মিনিট নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করবার পর হঠাৎ যেন হাতির কানের মতো কি নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরস্তূপ সচল হয়ে উঠল — তখন বুঝলাম হাতিই বটে। বস্তুত বন্য জন্তু নিশ্চল ভাবে বনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের অস্তিত্ব বোঝা দায় — সে হাতিই হোক, আর খরগোশই হোক। কিন্তু একটুমাত্র সচল হলেই তা সহজেই চোখে পড়ে যায়।

হাতি চোখে পড়া মাত্র ঐ দিকেই উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইলাম —দেখি, একটির পর একটি হাতি বৃক্ষবহুল শিখর দেশ থেকে পাহাড় বেয়ে পূব দিকে মৃদু মন্থর গতিতে সারি বেঁধে চলেছে, মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কখনও হঠাৎ শুঁড় দিয়ে মাটিতে বন্দুকের আওয়াজের মতো শব্দ ক'রে কান মেলে অপূর্ব ভঙ্গিতে মাথা ও শুঁড় তুলে গন্ধ নিচ্ছে, আবার কখনও ধূলির মেঘাবরণ সৃষ্টি ক'রে চলেছে। কিছু দূরে যায় আর থমকে দাঁড়ায়। কখনও বা উচ্ছৃঙ্খল জোয়ান হাতি দু-একটা গাছের ডাল মড়্ মড়্ শব্দে ভেঙে নিচ্ছে অথবা লাইন ছেড়ে আপন বয়সোচিত চাঞ্চল্যের পরিচয় দিচ্ছে। আবার আপন প্রমত্ততায় অপর কোনও সহচর কিংবা সহচরীকে শুঁড় কিংবা দাঁত দিয়ে আঘাত করছে—ছোট শাবকেরা গুট্ গুট্ ক'রে মায়ের আশেপাশে ঘুরে ফিরে খেলা করছে। মা কখনও কখনও সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে শুঁড় দিয়ে শাবককে টেনে আপন বুকের কাছে নিয়ে আসছে, অথবা সামান্য আঘাত ক'রে সতর্ক ক'রে দিচ্ছে। এই ভাবে সবগুলি হাতি একটি পরিত্যক্ত হাদাং-এ এসে দাঁড়াল।

ঠিক এইভাবে হাতির চলাফেরা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নি।

অনুশীলনী

১। ফাল্গুন মাসে চির-শ্যামল গারো পাহাড়ের কেমন চেহারা দেখেছিলেন লেখক ?

২। গারোদের গ্রামের বর্ণনা দাও।

৩। 'ফাগুয়া' মানে কী ?

৪। হাতির পাল দেখে লেখকের কী মনে হয়েছিল ? পাঁচটি বাক্যে হাতিদের চলা-ফেরার ছোট্ট বিবরণ দাও।

৫। মানে লেখো :

দৃশ্যপট, সঙ্গমস্থল, বনানী, মাচাং, তটভূমি, গাম্ভীর্য, স্বচ্ছন্দবিহারী, হস্তী-শাবক, তন্দ্রা-জড়িমা, হাদাং।

৬। বাক্য তৈরি করো :

নিষ্করুণ, প্রতিবিম্ব, জীবনযাপন, প্রাতঃকৃত্য, উচ্ছৃঙ্খল।

৭। ফাঁক ভরাও :

বাঁশের —। গারোদের —। আলক্‌ফাং —।

স্বচ্ছসলিলা —। গাম্ভীর্য —। পরিত্যক্ত —।

ঘোড়া যায়

গৌরী ধর্মপাল

গৌরী ধর্মপাল বি. এ.-তে ঈশান স্কলার, সংস্কৃতে ডক্টরেট। পেশায় অধ্যাপিকা —লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। ছোটদের ছড়া ও গদ্য-রচনায় সিদ্ধহস্ত।

এই ছড়াটিতে শুধু 'টগবগ' শব্দটার সাহায্যেই ঘোড়ার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হওয়ার অসাধারণ ছবি এঁকেছেন তিনি।



ঘোড়া	যায়	চার	পায়
বাধা	ভয়	এড়ি —	য়ে
কাদা	চর	বাদা	জল
জং-	গল	পেরি —	য়ে
টগ	বগ	টগ	বগ
টগ	বগ	টগ	বগ
টগবগ	টগবগ	টগবগ	টগবগ
টগবগ	টগবগ	টগবগ	টগবগ
টগবগটগবগ	টগবগটগবগ	টগবগটগবগ	টগবগটগবগ···

অনুশীলনী

১। কবিতাটি খুব মন দিয়ে পড়ে তারপর হাতে মাত্রা রেখে আবৃত্তি করতে হবে।

২। টগবগ ক'রে চলে এমন একটা ঘোড়া সম্পর্কে ৬ লাইনের একটা লেখা তৈরি করো।

৩। বাক্য তৈরি করো ঃ

বাধা, এড়িয়ে, কাদা, বাদা জল, পেরিয়ে।

গাগারিন

অমল দাশগুপ্ত

অমল দাশগুপ্ত (১৯১৯-): কলকাতায় জন্ম। গল্প-রচনায় ও অনুবাদে দক্ষ। মহাকাশ-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে লেখা তাঁর 'মহাকাশের ঠিকানা' বইটি উল্লেখযোগ্য।

মহাকাশে প্রথম মানুষ য়ুরি গাগারিন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায় এই অংশটি থেকে।



মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি অবশ্য এক লাইনে লিখে ফেলা চলে। — সোভিয়েত নাগরিক মেজর য়ুরি গাগারিন সাড়ে-চার টন ওজনের ভোস্তোক-১ ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর ১৭৫ থেকে ৩০০ কিলোমিটার উঁচু দিয়ে ৮৯·১ মিনিটে পৃথিবীর চারদিকে পুরো একবার ঘুরে আবার এই পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন।

এমনি ধরনের একটি ঘটনা যে ঘটতে চলেছে, তার আয়োজন অবশ্য অনেক দিন ধরেই চলছিল। তবুও, ঘটনাটি যে সত্যি সত্যিই ঘটতে পারে তা যেন বিশ্বের মানুষের ধারণায় ছিল না। এখন ঘটনাটিকে এক লাইনেই লিখে ফেলা যাচ্ছে, তারপরের আরো বড় ঘটনা ঘটে যাবার পরে গোড়ার এই ঘটনাটিকে পড়তেও সাধারণ মনে হচ্ছে — কিন্তু সব মিলিয়ে ভাবতে গেলে এখনো অবাক লাগে।

আর সব কিছু ছেড়ে দিলেও, অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন য়ুরি গাগারিন। মাত্র এক বছর আগে নকল মানুষ মহাকাশ থেকে ফিরে আসতে পারে নি। মাত্র পাঁচ মাস আগে দুটি কুকুর মাটিতে নামবার সময়ে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তবুও তিনি ইতস্তত করেন নি।

ঘটনাটি আরো একবার বলা যাক। ব্যোমযানটির নাম ছিল ভোস্তোক-১, ওজন ছিল সাড়ে-চার টন। মানুষটির নাম ছিল মেজর য়ুরি গাগারিন। কক্ষপথে পৃথিবীকে তিনি প্রদক্ষিণ করেছিলেন মাত্র একবার। আকাশে ছিলেন সবশুদ্ধু ১০৮ মিনিট। দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন ৪১,০০০ কিলোমিটার।

য়ুরি গাগারিনই প্রথম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে, রকেট উৎক্ষেপণের সময়ে ত্বরণযুক্ত বেগের দরুন যে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে হয় — যার ফলে অনেক সময়ে মানুষের ওজন ষোলোগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে — উপযুক্ত অনুশীলনের দ্বারা সেই সহ্যক্ষমতা মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব। আরও প্রমাণ করলেন যে, পরবর্তী কালের ভারহীন অবস্থাতেও সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যেতে পারে।

য়ুরি গাগারিনই প্রথম মানুষ যিনি অনেক উঁচু থেকে পৃথিবীকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। একটিমাত্র মন্তব্যে তাঁর তখনকার মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছিল। বলেছিলেন, 'কি সুন্দর এই পৃথিবী!' বলেছিলেন, 'আমি নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম পৃথিবীর আকার গোল।' আকাশকে কালো দেখেছিলেন, সেখানে ছিল জ্বলজ্বলে তারা।

দিগন্তকে দেখেছিলেন অসাধারণ সুন্দর, পৃথিবী যেন নরম নীল আভায় পরিবৃত ছিল।

১৯৬৮ সালে সাধারণ এক বিমান-দুর্ঘটনায় এই যুগ-প্রবর্তক মানুষটি মারা যান।

অনুশীলনী

১। গাগারিন মানুষের স্মৃতিতে কেন অমর হয়ে থাকবেন ?

২। গাগারিন কোন্ ব্যোমযানে মহাকাশ ভ্রমণ করেছিলেন? কতক্ষণ তিনি আকাশে ছিলেন? কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন? কতক্ষণ সময় লেগেছিল ?

৩। গাগারিন মহাকাশ থেকে পৃথিবী সম্পর্কে কী বলেছিলেন ?

৪। পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী মহিলার নাম জেনে নিয়ে লেখো।

৫। প্রবন্ধটি থেকে **পাঁচটি** ক'রে বিশেষ্য, বিশেষণ আর ক্রিয়াবাচক শব্দ খুঁজে বার ক'রে লেখো।

চাপাটির ইতিকথা

নরহরি কবিরাজ

নরহরি কবিরাজ ঃ প্রাবন্ধিক হিসাবে সুপরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা'।

এই গল্পাংশটিতে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) সম্পর্কে কিছু কথা জানা যায়। এই বিদ্রোহ শুধু কি সিপাহীদের বিদ্রোহ, না দেশের রাজা-বাদশা, জমিদার-তালুকদার, সেপাই বরকন্দাজ সবার মিলিত বিদ্রোহ, তা নিয়ে আলোচনা আজও চলছে। এ বিদ্রোহে ঘরের বৌ, ঋণগ্রস্ত গ্রাম্য মোড়ল প্রভৃতি সাধারণ মানুষরা কিরকম অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার একটা উদাহরণ মিলবে এই গল্পে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা রুটি বা চাপাটির মাধ্যমে সাংকেতিক খবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করে। সেই সম্পর্কেই এই গল্প।

ঠুক্, ঠুক্, ঠুক্ — দরজার শব্দ শোনা গেল। রহিম আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। ভিতর থেকে সে জিজ্ঞাসা করল — কে ? এত রাত্রে ?

হরিশচন্দ্র চাপা গলায় উত্তর দিলে — ভয় নেই, দরজা খোল, তোমার বন্ধু লোক।

রহিম দরজা খুলে এক গাল হেসে বলল — ভাই, দিনকাল খারাপ। সেপাইরা ক্ষেপেছে। সাহেবরা নাজেহাল হয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে উঠছে। ভয় হয় আবার কোনো হৈ-হুজ্জুতে জড়িয়ে না পড়ি — এই আর কি !

আরে ভাই, হৈ-হুজ্জুত সারা দেশটায়। হৈ-হুজ্জুতের ভয়ে তাহলে দেশ ছেড়ে পালাবে নাকি ?

রহিমুদ্দিন একটু লজ্জিত হল। কথাটা চাপা দিতে চেয়ে সে

বলল — থাক্ ওসব কথা, এখন বল তো ভায়া, এত রাত্রে আগমনের কারণটি কী ?

হরিশচন্দ্র বলল — ভাই, একটা জরুরী কাজে এসেছি। তোমার সাহায্য ছাড়া সে কাজ হবার নয়।

কথা বলতে বলতে হরিশচন্দ্র একটা কাপড়ের পুঁটলি থেকে এক গোছা চাপাটি বের করল। সে বলে চলল — ভাই, এই চাপাটি ক'খানা মৌলবী-পাড়ায় গিয়ে চৌকিদারকে পোঁছে দিয়ে আসতে হবে। চৌকিদারের সঙ্গে তো তোমার খুব খাতির। আজ রাত্রেই যদি একবার যাও…



রহিমুদ্দিন হতভম্ব হয়ে বলল — সে কি হে — এত রাত্রে এই রুটির গোছা নিয়ে চৌকিদারের কাছে যাব — এ আবার কোন্ রহস্য — একটু খুলে বল দেখি ভাই! হৈ-হুজ্জুতে পড়ে গেলাম বলেই যেন ঠাহর হচ্ছে।…থাক্ গে ওসব কথা। তুমি যখন বলছ, তখন যাব নিশ্চয়ই। তুমি নিশ্চিন্তে ফিরে যাও। আমি চৌকিদারের খোঁজে এখনই বেরুচ্ছি।

ঘন অন্ধকারে কানপুরের উপকণ্ঠে নীমার গ্রামটি তখন ছমছম করছে। লাঠিটি সম্বল ক'রে রহিম শেখ চলল পথ ভেঙে।

চৌকিদার ভাইয়া — বাড়িতে আছ নাকি?

হ্যাঁ, কী খবর?

সারা রাত্রি কী উপুস ক'রে রয়েছ নাকি? হরিশ তোমার জন্য একগোছা চাপাটি পাঠিয়েছে।

চৌকিদার সতর্ক দৃষ্টিতে চাপাটিগুলো দেখে নিল।

হাঁ — সেই চাপাটিই তো! সেই ছোট্ট ছোট্ট সাইজ, হাতে হাতে বেশ ময়লা হয়ে উঠেছে। কোন কোন জায়গায় হাত বদল করতে করতে চাপাটিগুলো ছিঁড়ে গেছে।

চৌকিদার কোম্পানির চাকরি করে। তাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে রহিমকে বলে — সাবধান, এই চাপাটির কথা থানার সাহেব যেন টের না পায়। চল — গ্রামে যত বাড়ি আছে, প্রত্যেক বাড়ির মরদের হাতে এই চাপাটি পৌঁছে দিতে হবে। একজনের কাজ হবে পাশের বাড়ির লোকের কাছে চাপাটিগুলো পৌঁছে দেওয়া। সে আবার আর এক জনকে পৌঁছে দেবে। এমনিভাবে একজন আর এক জনকে, সে আবার তৃতীয় জনকে — এই ভাবে সারা গাঁয়ের প্রত্যেক লোকের হাতে এই চাপাটি পৌঁছে দিতে হবে ভায়া!

রহিমুদ্দিন চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল — সে কি ভায়া! চাপাটি নিয়ে আবার এ কী খেলা আরম্ভ করলে? এর সঙ্গে সিপাইদের হৈ-হুজ্জুতের কোন সম্পর্ক-টম্পর্ক নেই তো? সাবধান ভাই, সাবধান! দিনকাল বড় খারাপ। কাল একটা ব্যাপার শুনে তো একেবারে তাজ্জব। আমার ছেলেটা তো পল্টনে কাজ করে। সে কাল এসেছিল বাড়িতে। উড়ো-উড়ো ভাব, ফিস-ফিস ক'রে তার মা'র সঙ্গে কি সব কথা বলল। তার মা তো শুনে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়! খবর নিয়ে শুনলাম — সে নাকি সিপাইদের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। পরশু দিন রাতে মিরাটের সিপাইরা কানপুরের সিপাইদের

যিনি বড় চাঁই তাকে নাকি একটা গোলাপ পাঠিয়েছিল। সে ঐ গোলাপ নাকি তার অধস্তন সিপাইকে পাঠায়। সে আবার একজনকে, পরের জন আর একজনকে — এমনি ক'রে সারা পল্টনে নাকি ঐ গোলাপের কথা ছড়িয়ে পড়ল। গোলাপ যে স্পর্শ করল সে-ই নাকি প্রতিজ্ঞা করল যে রক্ত দিয়ে ঐ গোলাপের সম্মান রক্ষা করবে। রক্ত দিয়ে কোম্পানিকে এ-দেশ থেকে তাড়াবে। এক রাত্রিতে নাকি সারা পল্টন মেতে উঠেছে — আমার ছেলেটাও তাদের কথায় নেচে উঠেছে। দিনকাল ভাই বড়ই খারাপ! তাই বলছি কি — এই চাপাটির গোছা নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান কী ভালো হবে?

বড় ভালোই আছ মিঞা! পেটে নাই ভাত। পরনে নাই কাপড়। কোম্পানিতে সব লুটে-পুটে নিয়ে গেল। তারপরেও আর ছেলের দোষ দাও কী ক'রে? কোন জোয়ান-মরদ কী এইসব দেখতে পারে?

রহিমুদ্দিন দ্বিরুক্তি না ক'রে চৌকিদারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বাড়ি — সারা গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে তারা পৌঁছে দিল চাপাটির মর্মকথা।

এত আর্তনাদ, এত মৃত্যু, এত রাগ, এত ঘৃণা দিয়ে যে ঐ চাপাটিগুলি তৈরি তা তো রহিমুদ্দিন এর আগে ভাবতে পারেনি!

অনুশীলনী

১। সিপাহী বিদ্রোহ কবে হয়? কারা এর নায়ক ছিলেন?

২। হরিশচন্দ্র রহিমুদ্দিনকে গভীর রাতে কিসের বাণী এনে দিলেন?

৩। রহিমুদ্দিনের ছেলে যে সিপাহীদের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে, তা কী ভাবে বোঝা গেল?

৪। গোলাপ আর চাপাটির গোছা কী ভাবে বিদ্রোহের মর্মকথা ছড়াল?

কৃতজ্ঞতা

এই ষষ্ঠ পাঠ গ্রন্থের পাঠ্যাংশগুলির প্রারম্ভে যেসব লেখক-জীবনটীকা সন্নিবিষ্ট হল, সেগুলি সংকলনে সহযোগিতা করেছেন ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু। 'ঠুকে-মারি আর মুখে-মারি' গল্প এবং 'বিলাতফের্তা' কবিতার জন্য কৌশলী আলোকচিত্র সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন শ্রীরেবন্ত কুমার ঘোষ। এঁদের জানাই ধন্যবাদ।

নিজে পড়ি

ষষ্ঠ পাঠ

এই ষষ্ঠ পাঠ 'নিজে পড়ি' ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী বাংলা পাঠ্য বই (reader)। এই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এরই পরিপূরক 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' ষষ্ঠ ভাগ বইটি প্রকাশিত হয়েছে, যেটি অনুশীলনী বা সহায়ক পুস্তক (workbook)। বই দু'খানি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে গোড়া থেকেই ছেলেমেয়েরা সহজে বাংলাভাষা চর্চা করতে শেখে — বিভিন্ন ধরনের গল্প, কবিতা, ও প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তারা এই ভাষা আয়ত্ত করতে উৎসাহ পায়।

এই পুস্তকমালার লেখিকা একজন অভিজ্ঞ শিক্ষিকা এবং তিনি এই স্তরের আরো অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এর পরিকল্পনা করেছেন। তার ফলে এই পুস্তকগুলি বাংলা শেখার অন্যতম প্রধান ও সর্বাধুনিক পুস্তকমালা হয়ে উঠেছে।

প্রথম শ্রেণীর আগে স্তরে, অর্থাৎ প্রস্তুতি শ্রেণীর (Preparatory) জন্য কেবল 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' [প্রাথমিকা]-সহ এই পুস্তকমালায় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য দু-খানি ক'রে (পাঠ্য ও অনুশীলনী) পুস্তক পরিকল্পিত হয়েছে। আকার ও আয়তন পৃথক হলেও প্রতিটি পুস্তক পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিক ও ক্রমাগ্রসর (graded) পদ্ধতিতে ও নিয়ন্ত্রিত শব্দ-সমষ্টি (controlled vocabulary) বজায় রেখে এগুলি রচিত হয়েছে।

বাংলা যাদের দ্বিতীয় ভাষা এবং বাংলা যাদের প্রথম বা মাতৃভাষা — উভয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই মধ্যশিক্ষা স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষায় একই যোগসূত্রে মিলতে পারবে এই পুস্তকমালায়, কারণ এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং Indian School Certificate Examination নির্ধারিত বাংলা পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।

Bandyopadhya, Gita : NIJE PARI [Bengali, Rea
ISBN 0 86131 718 1